দু নম্বর

বুদ্ধদেব গুহ

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন । কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ—রাসপূর্ণিমা, ১৩৬৬

প্রচ্ছদ

শ্রীসমর দে

প্রকাশক ও মুদ্রক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র, এম-এ

বোধি প্রেস। ৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

চিরতরুণ, একা এবং অনন্য
শ্রীকল্যাণকুমার রায়-কে
অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে

"You are asking me questions, and I hear you;
I answer that I cannot answer you must find out for yourself."

এই লেখকের

কয়েকটি বিশিষ্ট উপন্যাস

খেলা যখন

সুখের কাছে

নগ্ন নির্জন

একটু উষ্ণতার জন্যে

বাতিঘর

জঙ্গলের জার্নাল

ঝাঁকিদর্শন

চবুতরা

কোয়েলের কাছে

পারিধী

লবঙ্গীর জঙ্গলে

বাবলী

স্বগতোক্তি

ইত্যাদি...

কয়েকটি গল্প-সংকলন

বনবাসর

আয়নার সামনে

প্রথমাদের জন্যে

পহেলী পেয়ার

কুন্দহার (বেরুবে)

ছোটদের বই

জঙ্গল মহল

ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে

মউলির রাত

বনবিবির বনে (বেরুবে)

ভ্রমণোপন্যাস

প্রথম প্রবাস
(পটভূমি ইয়োরোপ)

ওয়াইকীকি (বেরুবে)

(হাওয়াই-এর পটভূমিতে রহস্যোপন্যাস)

এই উপন্যাসে বর্ণিত সমস্ত চরিত্রই কাল্পনিক।

শিবেনবাবু অবাক হলেন। কারোই ত আসার কথা ছিলো না এখন? তবে? ইনি কে?

অফিসে এখন আর কেউই নেই বলতে গেলে। পুরোনো বেয়ারা রঘু এবং জুনিয়র রামু ছাড়া।

রামুকে ভদ্রলোক কি যেন বললেন। তারপর রামু এসে বলল, উনি দেখা করতে চান।

শিবেনবাবু মনে মনে বিরক্ত হলেন। ঘড়িতে প্রায় আটটা বাজে। বিকেল পাঁচটা অবধি আজ ট্রাইব্যুনালে একটা বড় পার্টি-হার্ড ম্যাটার আর্গু করেছেন। সকালে হাইকোর্টেও গেছিলেন। তারপরও এতক্ষণ কাজ করেছেন—এখন আর ভালো লাগে না।

তবুও, ভদ্রলোককে আসতে বললেন শিবেনবাবু। মক্কেল; লক্ষ্মী!

ইট-চাপা ঘাসের মত ফ্যাকাশে হলুদরঙা বেঁটে-খাটো কিন্তু গাট্টাগোট্টা ভদ্রলোক হাত জোড় করে ছিলেন। পরনে মিহি মিলের ধুতি, বাফ্‌তার পাঞ্জাবী এবং কালো পাম্প-শু।

বসার পরও উনি কোনো কথা বললেন না। অনেকক্ষণ পর হাত-জোড়-করেই ভদ্রলোক বললেন, আমাকে বাঁচাতে হবে স্যার। আপনি ছাড়া কেউ বাঁচাতে পারবেন না।

শিবেনবাবু ভদ্রলোকের নাটুকে-পনা দেখে অবাক হলেন, একটু। কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে বিরক্তও হলেন। আজ শ্যাম মালহোত্রার জন্মদিনের পার্টি। সেখানে যেতে হবে।

শিবেনবাবু আরেকবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, কেস্‌টা কি?

আগন্তুক বললেন, সার্চ অ্যান্ড সিজার। ইনকাম ট্যাক্স থেকে রেইড্‌ হয়েছিল—ডিরেকটরেট অব ইনসপেকশানের লোকেরা এসেছিলেন।

—কবে? শিবেনবাবু সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে গতকাল।

—কি পেয়েছে? ক্যাশ?

—গয়নাগাঁটি ও খাতা। ক্যাশ ছেল, কিন্তু খুঁজে পায়নি।

—কোন্‌ খাতা? এক নম্বর, না দু নম্বর?

—দু নম্বর!

—এক নম্বরের সঙ্গে মিল ছিলো না?

—থাকলে কী আর আপনার দুয়ারে আসি?

—তা হলে—

—এক নম্বরের ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে তিরিশ হাজার। দু নম্বরের অ্যাকাউন্টে কুড়ি লাখ।

—আই সী! শিবেনবাবু বিস্ময়ের ভাব গোপন রেখে বললেন। তারপর বললেন, জুয়েলারী?

—চার লাখ।

—আপনার হিসেবে?

—আজ্ঞে। মানে কেনার দামের হিসেবে। ডিপার্টমেন্টাল ভ্যালুয়ারের হিসেবে সাত লাখ। সিজারের দিনের ভ্যালু।

—বুঝলাম। শিবেনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, আজকে আমার এক্ষুনি উঠতে হবে। আজ হবে না। তবে কি কি আনবেন লিখে নিন। আর এগুলো নিয়ে পরশু আসুন।

—কখন স্যার?

শিবেনবাবু বললেন, সামনের সোমবার। বিকেল তিনটে।

—তার আগে হয় না?

—মধ্যে তো শনিবার পড়ছে। একটা দিন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভদ্রলোক বললেন, তাই-ই হবে। কি কি আনব বলুন স্যার? তারপর একটু থেমে বললেন, কেস্‌টা আপনি নেবেন বলে কথা দিচ্ছেন তো?

আগন্তুকের শেষের প্রশ্নটি তাঁর শুনতে ভাল লাগল।

একটুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন শিবেনবাবু।

তারপর বললেন, গত পাঁচ বছরের ব্যালান্স-শীট ও প্রফিট অ্যান্ড লস্ অ্যাকাউন্ট, এ্যাসেসমেন্ট অর্ডার—অ্যাপীল ট্রাইব্যুনালের অর্ডার যদি থাকে—। আর সিজার লিস্ট্‌ও। পঞ্চনামাও। খাতাপত্তরের, গয়নার; সবকিছুর।

তারপর শুধোলেন, ডিপোজিশনের কপি দেয়নি, না? তারপর নিজেই স্বগতোক্তি করলেন, আজকাল অবশ্য ডিপার্টমেন্ট কপি দিচ্ছে না প্রায় কোনো কেসেই।

—না স্যার। তবে যতটুকু মনে ছেলো, সঙ্গে সঙ্গে লিখে নিয়েছি। তার থেকে জবানবন্দী তৈরি করে আনব এখন।

—আনবেন, বলেই শিবেনবাবু উঠলেন।

হাত-জোড়-করা ভদ্রলোক বললেন, এই টাকাটা।

ভদ্রলোক দশ টাকার নোটের একটা পাঁচশো টাকার বাণ্ডিল বার করলেন।

শিবেনবাবু বললেন, কাজ হোক। টাকা দেওয়ার তাড়াহুড়ো কি?

তারপর বললেন, আপনাদের কোনো উকিল নেই? আপনাদের ট্যাক্স ম্যাটারস্ কে দেখাশোনা করেন?

—সে একজন আছেন স্যার। কিন্তু তিনি এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না। তারপর একই নিশ্বাসে বললেন, স্যার টাকাটা?

শিবেনবাবু একগাল হাসলেন। বললেন, যখন নেওয়ার, তখন নেবো। বলেই বললেন, ঠিক সময়ে আসবেন পরশু।

গাড়িটা ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে রেড রোডে পড়ে সোজা চলতে লাগল। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হু-হু করে হাওয়া আসছে ঠাণ্ডা। দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ফুচকাওয়ালা, ভেলপুরীওয়ালা, কোকা-কোলাওয়ালাদের কারবাইডের আলোগুলো সুন্দর বিন্দু বিন্দু আগুনের একটা প্যাটার্ণ গড়ে তুলেছে। হাওয়ায় কাঁপছে আলোর শিখাগুলো।

রাম অবতার গাড়ি চালাচ্ছিল। তার পাশে শিবেনবাবুর ব্রিফ্-কেস, টিফিনের

বাক্স, থার্মোফ্লাস্ক, জলের বোতল। ঠাকুর কফি আর স্যাণ্ড-উইচ বানিয়ে দেয়। নেপালচন্দ্রর দোকান থেকে সন্দেশ আনিয়ে দেন রোজ তাঁর স্ত্রী মাধবী। জীবনে অনেক কিছুই স্ত্রীকে দিলেন তিনি, কিন্তু মাধবী রোজই শোবার সময় ঘ্যান্ ঘ্যান করেন, নর্থে থাকতে নাকি আর ভাল লাগে না ওঁর। সাউথ-এ জমি কিনে একটা বাড়ি করতে হবে। আলিপুর, যোধপুর পার্ক, নিউ আলিপুর যেখানে হয়।

গাড়িটা সার্কুলার রোডে পড়ে রবীন্দ্রসদনের সামনে ট্র্যাফিক সিগন্যালে দাঁড়ালো।

শিবেনবাবু ভাবছিলেন। উনি হাওড়া কোর্টে যখন প্র্যাকটিস করতেন তখন শিবেনবাবুর সিনিয়র মোহিতবাবু বলতেন, গাধা পিটিয়ে যদিও বা ঘোড়া করা যায় শিবেন, তোমার দ্বারা ওকালতী হবে না। এ-লাইন ছেড়ে দাও, হাওড়া হাটে গিয়ে গামছা বেচো—আখেরে কাজ দেবে। মানুষটা বড় দাম্ভিক ছিলেন। শিবেনবাবু বলেছিলেন, ঠিক আছে। ওকালতী হয় কি হয় না দেখিয়ে দেবো একদিন।

ক্রিমিন্যাল ও সিভিল প্র্যাকটিস্ তিনি ছেড়েছিলেন। তারপর কি করে নগেনদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে গেল।, আরেকজন দাম্ভিক লোক। আজ শিবেন ব্যানার্জিকে ইনকামট্যাক্সের বার-এ প্রায় সকলেই চেনেন। হাওড়া কোর্টে থাকলে সারা জীবনে উনি যা না রোজগার করতে পারতেন, পঞ্চান্ন বছর বয়সে তার চেয়ে অনেক বেশিই বোধহয় রোজগার করেছেন। আইন-কানুন দিন দিন কড়া হয়েছে। কমপ্লিকেশান বেড়েছে। খেটে কাজ করেছেন—ধীরে ধীরে নাম হয়েছে। ফ্যাক্টস্ ভাল করে গুছিয়ে প্রথম প্রথম মক্কেলের টাকাকে নিজের টাকা মনে করে জান-প্রাণ দিয়ে লড়েছেন। আজ উত্তর কোলকাতায় নিজের বাড়ি, ভূপেন বোস এ্যাভিনিউতে ফ্ল্যাট। ভাড়ায় দিয়ে রেখেছেন। ছেলে-মেয়েকে ভাল স্কুলে পড়াচ্ছেন।

রাম অবতার যখন গাড়ি চালায় আর শিবেনবাবু যখন পিছনের সীটে বসে দামী সিগারেটের প্যাকেট থেকে আলতো করে সিগারেট বের করে সেই সিগারেট ধরান তখন ওঁর মনে যে একটু আত্মশ্লাঘা না হয়, এমন নয়।

রাম অবতারকে সংক্ষিপ্ত অর্ডার দিলেন শিবেনবাবু—মালহোত্রা সাব্‌কো কোঠী।

মালহোত্রার স্টীলের কারবার। শিবেনবাবুর মক্কেল। কানেক্‌শানস্ খুব ভালো। অনেক মক্কেল পেয়েছেন শিবেনবাবু এঁর মাধ্যমে। মালহোত্রা ম্যানুফ্যাকচারার নয়, ডীলার। অর্ডার সাপ্লায়ার। এর টুপী ওকে পরায়। প্রায়ই পার্টি লেগে আছে।, ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ার এমন কোনো নামকরা কোম্পানী নেই—যাদের পারচেজ ম্যানেজার বা ম্যাটেরিয়ালস্ ম্যানেজাররা শ্যামকে চেনেন না বা তাঁর বাড়ির পার্টিতে আসেন না।

গাড়িতে-গাড়িতে ছয়লাপ। লনে টুনি বালব্ জ্বলছে। এ-এ-ই-আই-এর অ্যাটেণ্ডেন্টরা, ট্র্যাফিক পুলিশ ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করছে।

মিস্টার মালহোত্রার লনে স্কচ-হুইস্কী জলের মতো বইছে। লনের এক কোণায় রোমালী রোটি আর কাবাবের স্টল হয়েছে, ওপেন-এয়ার। লনের অন্য পাশে বার-বি-কিউও হচ্ছে সাকলিং পিগ্-এর।

গেট দিয়ে ঢুকে একটু যাবার পরই শ্যাম মালহোত্রার স্ত্রী দীপিন্দর এসে লাস্যময়ী ভঙ্গিমায় বললেন, হাউ কাম? অল এলোন? হোয়ার ইজ মাধবীদিদি?

শিবেনবাবু বললেন, সোজা অফিস থেকে আসছি।

দীপিন্দর চোখ বড় বড় করে কপট রাগের সঙ্গে বললেন, দিস ইজ অ. পার্ডনেবল।

মাধবীলতা ইংরিজীটা ভালো বলতে পারেন না। শিবেন চক্রবর্তীর প্রফেশন্যাল কেরিয়ারে এটাই একটা ডিসএড্‌ভান্টেজ। অথচ শিখেও নেননি মাধবী। ইংরিজী অনেকের চেয়ে ভালো জানেন, কিন্তু বলতে পারেন না। তাছাড়া এইসব হুল্লোড়ে পার্টি পছন্দ নয় তাঁর।

শ্যাম শিবেনবাবুকে দেখতে পেয়ে টেনে নিয়ে গেলেন ভিতরে। বিরাট এয়ার-কন্ডিশানড ড্রয়িং রুমে শ্যামের বিশেষ পেয়ারের লোকেরা। আধো-অন্ধকার ঘরটা। সিগারেটের ধোঁয়ায় মেঘলা হয়ে আছে। মিকি কাপুর, জন চ্যাটার্জি, বব নন্দী, আরো অনেকে। বব্‌-এর সঙ্গে একটি অল্পবয়সী মেয়ে—বেঁটে কিন্তু ভারী সুশ্রী চেহারা। কাটা-কাটা চোখ মুখ। হলদের উপর লাল ফুল-ফুল লুঙি পরে এসেছে।

অনিমেষ সেনগুপ্ত কোলকাতার একটা ছোট অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে কাজ করে। হুইস্কী খেয়ে অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। এগিয়ে এসে বলল, হাই! শিবেনবাবু ওকে চিনতেন। বয়সে প্রায় কুড়ি বছরের ছোট যদিও অনিমেষ। এক সময় হাওড়ার এক এঁদো গলির মধ্যে থাকতো অনিরা। খুবই দুর্দশায় ছিল সবদিক দিয়ে। আজ ভাল চাকরি করে দেখে ভাল লাগল শিবেনবাবুর। অনি তখন আন্ডারওয়্যার পরে ঘুরে বেড়াতো বাড়িময়, হয়তো বাড়িতে পরার জামা-কাপড় ছিলো না বলেই। এই সন্ধ্যেতে অনিমেষ একটা কমলা-রঙা জিনের ফ্লেয়ারের উপর কমলার মধ্যে শাদা স্ট্রাইপ তোলা পাঞ্জাবী পরে ডান হাতে হুইস্কীর গ্লাস ধরে অন্তরঙ্গতার সুরে বলল, শোনাও শিবুদা।

যেন শিবেনবাবু অনিমেষের ইয়ার।

বলেই, বব নন্দীর সঙ্গের সেই বাঙালী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, আই অ্যাম গোয়িং স্টেডী উইথ হার।

শিবেনবাবু হুইস্কীতে একটা বড় চুমুক দিয়ে গাম্ভীর্যমাখা গলায় বললেন, বাঃ। খুব ভালো। কোথায় আলাপ হল?

অনি বলল, মডেলিং-এর জন্য এসেছিল। হাতের আঙুলগুলো প্রথমে খুব ইম্প্রেস করে আমাকে। তারপর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ!

বলেই বাঁ হাতটা শিবেনবাবুর নাকের সামনে নেড়ে বলল, ওঃ বয়! সী ইজ আ টেররীফিক ফাস্ট ওয়ার্কার।

তারপর বাঁ হাতের আঙুলগুলো চোখের সামনে তুলে টাকার মত গোল করে অনি বলল, মাই বার্ডি! শী রিয়্যালী হ্যাজ ইট্‌! আ জেম্‌ অফ আ...।

বব্‌ নন্দীকেও শিবেনবাবু চিনতেন। শিবেনবাবুর মনে পড়ে গেল বব নন্দী অনিমেষের বস্‌। বব নন্দীর বাবার তেলকল ছিলো পেনেটীতে—স্বদেশী করে জেল খেটেছিলেন। বনবিহারী নন্দীর ছেলে বব নন্দী দেশ স্বাধীন হবার পঁচিশ বছর পর বিজ্ঞাপনদাতাদের কারণে ও কল্যাণে কট্টর সাহেব হয়েছে। সাবান, সর্ষের তেল, দাদের মলম, বিছানার চাদর এই সবের অনেক প্রস্তুতকারক ওদের মক্কেল। ঐ ছোট্ট কোম্পানীর বড় সাহেব ও।

ওরা কতক্ষণ আগে পার্টিতে এসেছিল জানতেন না শিবেনবাবু। কিন্তু বব্‌ও অত্যন্ত হাই হয়ে গেছে দেখলেন। হঠাৎ শিবেনবাবুর সামনেই বব্‌ এসে অনিমেষকে বলল, কুসিক নিয়ে যাচ্ছি আমার ফ্ল্যাটে—ফর দ্য নাইট—। শী ওনট্‌ গেট ডিপ্রিসিয়েটেড।

অনিমেষ বলল, বাই নো মীন্‌স স্যার। আমি আপনার কোম্পানীর!—সো কুসি।

কুসি বলে মেয়েটি অনিমেষের গলা জড়িয়ে বলল, গুডনাইট ডার্লিং—বলে চুমু খেল।

অনিমেষ চাপা গলায় মেয়েটিকে বলল, বব ইজ ভেরী টেন্ডার। হি ওনট্ হার্ট ইউ। গিভ ইট টু হিম—অ্যান্ড গিভ ইট গুড। হি ইজ মাই বস্। মাই ডেস্টিনী। অ্যান্ড ইয়োরস টু।

কুসি আর বব্ চলে গেল। শিবেনবাবু এই কথোপকথন শুনে উত্তেজিত হয়ে পর পর চারটে হুইস্কী খেলেন। অতি দ্রুত।

অনিমেষ বলল, কাজকর্ম কেমন শিবেনদা?

শিবেনবাবু বললেন, চলছে। উপরের দিকে সব সময়েই স্কোপ। স্কাই ইজ দ্যা লিমিট। তারপর বললেন, তোমার?

—আমাদের? বলে, অনি একটা হেঁচকি তুলে বলল, আমাদের ওপরে নীচে সব জায়গায়ই সমান স্কোপ। লিপস্টিক, স্যানিটারি ন্যাপকিন এবং জুতোরও বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব আমাদের। কিন্তু হোয়াটেভার উই অ্যার্ন ইট গোজ ইন ট্যাক্সেস।

তারপরই শিবেনবাবুকে স্যাভিংস সমঝে বলল, কিছু করো আমাদের জন্যে শিবেনদা।

বলেই, স্কচের গেলাসটা শিবেনবাবুর নাভির কাছে দোলাতে দোলাতে বলল, উই ওল আর ওয়ার্কিং ফর দ্য মালটিপ্লায়িং মাসেস্। কিন্তু ফ্রি-লান্সিং করে যা পাই, তার কিছুই কিন্তু দেখাই না। ধরে ফেলবে না তো কোনদিন ক্যাঁক করে?

শিবেনবাবুও হাই হয়ে গেছিলেন, বললেন, আমি ত আছি। ভয় কিসের?

কখন যে রাত এগারোটা বাজল খেয়াল ছিলো না শিবেনবাবুর। ড্রয়িং রুমের নিষ্প্রভ আলো, স্কচের নেশা, নানারকম পারফ্যুম, ইন্টিমেট, টোপাজের গন্ধ, সিল্কের লুঙির, শাড়ির কামিজের মৃদু খসখস্ শব্দ সব মিলে মিশে নেশা হয়েছিল তাঁর।

হঠাৎ উনি দেখলেন, লেপার্ড কাউর আর পুষি কাউর ড্রয়িং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছেন। চোরের মতো।

শিবেনবাবু জানতেন যে, লেপার্ড কাউরের অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে। পরিমল নাথের সঙ্গে দোস্তী আছে। নাথের সঙ্গে দোস্তী থাকা মানেই দিল্লীতে দোর্দণ্ড প্রতাপ। ইচ্ছে করলেই যা-কিছু করতে পারেন এ সব ক্ষণজন্মা লোকেরা। বয়েস কম হলে কি হয়, লেপার্ড কাউরের মতো উদ্‌যোগী যুবা পুরুষরাই এখন দেশের কর্ণধার হয়ে গেছে। মিস্টার কাউরের সঙ্গে শিবেনবাবুর আলাপ থাকলেও, এখনও তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি। শিবেনবাবু এগিয়ে গেলেন। জড়ানো গলায় বললেন, কি হয়েছে মিস্টার কাউর?—হোয়াটস দ্যা ম্যাটার?

পুষি ফিকে ম্যাজেন্টারঙা লিপস্টিক মাখা ঠোঁটে বাঁ হাতের তর্জনী ঠেকিয়ে বললেন, শা-শ্-শ্-শ-শ। গোলমাল করবেন না। দ্যা পার্টি উইল গেট ডিস্টার্বড।

—কী হলো কি? শিবেনবাবু আবারও শুধোলেন। গলায় হুইস্কি মেশানো অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে।

লেপার্ড বললেন, নাথিং মাচ।

তারপর বললেন, মাই ওয়াইফ হ্যাজ জাস্ট ড্রপড্ ওয়ান অফ হার ডায়মণ্ড ইয়ারটপস্।

—কোথায়? আতঙ্কিত গলায় শিবেনবাবু শুধোলেন। আরেকবার হেঁচকি তুলে বললেন, হীরে?

লেপার্ড ক্যাজুয়ালি ঘরের কার্পেট দেখিয়ে বললেন, সাম হোয়্যার ওভার

দেয়ার।

শিবেনবাবু উদ্বেগের সঙ্গে বললেন, বড় আলোগুলো জ্বালাই ঘরের? কোথায় পড়ল? আলো জ্বাললেই ঝিক্‌মিক্‌ করে উঠবে।

শ্যাম মালহোত্রা তক্ষুনি লন থেকে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। শিবেনবাবু ডাকলেন, শ্যাম্‌। ও'র গলা খুব উত্তেজিত শোনাল।

কিন্তু লেপার্ড আর পুষি ও'র মুখ চেপে ধরলেন।

পুষি বললেন, এই ঘরেই কোথাও পড়েছে। কিন্তু দিস পার্টি ইজ ওয়ার্থ আ হোল মাইন অব ডায়মণ্ডস। ডোন্ট বদার। গুড নাইট। যেটা পড়ে গেছে সেটার মতো একটা কিনে নেব।

বলেই ও'রা বেরিয়ে গেলেন।

শিবেনবাবুর মনে হলো যে, কাউরেরা যে একটা হীরের শোকে মুহ্যমান হন না এটাই প্রাঞ্জলভাবে প্রমাণ করার জন্যে ও'রা চলে গেলেন। ও'রা জানতেন যে এ পার্টির সবাই পরে এ ঘটনা শুনে বলবেন, ফ্যান্টাসটিক, টেররীফিক্‌। সেটাই কমপ্লিমেন্ট।

রুমালী রোটি আর কাবাব এত ভালো হয়েছিল যে বলার নয়। কয়েক বছর আগে ব্যাঙ্গালোরে কাজে গিয়ে যখন অশোকা হোটেলে উঠেছিলেন তখন স্যুইমিং পুলের পাশে খেয়েছিলেন শিবেনবাবু। বার-বী-কিউটাও চমৎকার হয়েছিল।

যখন শ্যাম ও দীপিন্দর-এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোলেন শিবেনবাবু তখন রাত প্রায় পৌনে একটা।

গাড়িতে ওঠার আগে শ্যাম শিবেনবাবুকে ডেকে নিয়ে বলেছিল, কেয়া দাদা, উ লুঙিওয়ালা ছোকরীকো পসন্দ্‌ আয়া? বলো তো ইন্তেজাম ক'রু।

শিবেনবাবু একটা ধাক্কা খেলেন। বললেন, হাম ঐসে আদমী নেহী হুঁ।

তারপর মনে মনে বললেন, ছেলেমেয়ে বড় হয়ে গেছে। এই শ্যামদের মতো উনি ডেয়ার-ডেভিলও নন।

রাম অবতার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

শিবেনবাবুর খুব আরাম লাগছিল। অতগুলো হুইস্কির পর ভরপেট খাওয়া। তারপর ড্রাম্বুই। অনিমেষ বলছিল যে, ড্রাম্বুই-এর জোরেই নাকি উইনস্টন চার্চিল সেকেণ্ড ওয়ার্লড ওয়ার জিতেছিলেন। সায়েবদের ব্যাপার। শ্যাম রেঙ্গুন থেকে স্মাগলড হয়ে আসা একটা সিগার দিয়েছিল শিবেনবাবুকে। সিগারটা বড় ভাল। পিছনের সীটে আধো-শুয়ে শিবেনবাবু বড় আরামে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন।

শহরের দেওয়ালে-দেওয়ালে, পোস্টার পড়েছে—আনাচে কানাচে নেতার ছবি দিয়ে। "আপনিই জনতা, জনতাকে ভোট দিন"। শিবেনবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। গত পনেরো দিন কাজকর্ম কিছুই হয়নি। জুতোর তলা ক্ষইয়ে ফেলেছিলেন একটা ইলেকশনের টিকিটের জন্য। তাঁর বড় সম্বন্ধী দিলেন না। শিবেনবাবু পয়সা-ফয়সা কিঞ্চিৎ করেছেন, এখন একটু ইজ্জত পাওয়ার ইচ্ছা। তাঁর সম্বন্ধীই ডোবালেন তাঁকে। রাজনীতির মতো পেশা আর দুটি নেই আজকাল। দু নম্বর নেতায় আর দেশসেবকে দেশ ছেয়ে গেছে। এরা কেবল জার্সি বদলায়।

গাড়িটা জোরে চলেছিল পার্ক স্ট্রীট দিয়ে। এখন রাস্তা ফাঁকা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল শিবেনবাবুর। উনি একবার ভাবলেন, জিজ্ঞেস করেন রাম অবতারকে যে সকালের পর ও আর কিছু খেয়েছিল কিনা এবং খেলে কখন খেয়েছিল।

কিন্তু অনিমেষের লুঙি-পরা ভাবী স্ত্রী (?) এখন বব নন্দীর ফ্ল্যাটে লুঙি খুলে ফেলেছে। সেই বেঁটে-খাটো ছোট কিন্তু নিমকিন মেয়েটার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। লুঙি খুলে ফেলার পর তাকে কেমন দেখাচ্ছে মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন শিবেনবাবু। রাম অবতার খেয়েছে কিনা সে কথা আর জিজ্ঞেস করা হলো না। আরাম। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম। কুসি!

বব নন্দী নাকি সুরে অ্যামেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজী বলে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়েনি, কিন্তু সার্ত্র্, কাফকা, সল্ বেলো পড়েছে।

বব নন্দীর বেডরুমটা এয়ার কন্ডিশানড; বব এ্যাকমপ্লিশড। বিজ্ঞাপন অফিসে শুধু যে এত বড় একটা বিজ্ঞাপিত চাকরী করে ও তা-ই নয়, ইংরিজী ও বাংলায় আধুনিক কবিতাও লেখে। গো গো গো লাইফ লিড করে। আজকের ইঙ্গোখিচুড়ি সমাজ বিজ্ঞাপনের জগত এবং বব-এর চার্মিং পার্সোন্যালিটি সব মিলেমিশে বর্তমান বাংলা ভাষায় সোজা করে বললে বলতে হয় 'বব ইজ বীটিং ইট আপ।'

ড্রেসিং টেবিলের উপরের ব্র্যাকেট থেকে হলুদ আলোটা জ্বলছিল। কুসি ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলে বসেছিল। ওর অনাবৃত সিঁদুরে আমের মতো ঈষৎ-নোয়া বুক ও কাঁধ সমান বব করা চুলের কালো নরম ছায়া পড়েছিল আয়নায়। পর্দার ভারী কাপড়ের চকোলেট রঙা ছায়াও এসে পড়েছিল আয়নায়।

বব বিছানায় শুয়েছিল মাথার নীচে দুটো বালিশ দিয়ে। ডাকল কুসিকে, কাম ডার্লিং।

আই-ব্রো পেন্সিল ঘষা প্লিক-করা মিথ্যে ভুরু তুলে কুসি চুল ঝাঁকিয়ে নেড়ী কুত্তার মতো সরু ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, হোয়াটস দ্য হারী? আই অ্যাম হিয়ার ফর দ্য হোল্ নাইট এন্ড দ্য নাইট ইজ ভেরী ইয়াং।

বব বলল, হোয়াই অনলি ফর দ্য নাইট? হোয়াই নট ফর দ্য রেস্ট অব ইওর লাইফ? স্ক্রু দ্যাট অনিমেষ। আমিই ওকে এই কোম্পানীতে এনেছি। ঝপ করে ফেলে দিলে, না খেয়ে মরবে ও। ফ্রী-লান্সিং করে ক'পয়সা রোজগার করে দেখব। ও বড় সোয়েল-হেডেড হয়ে গেছে। পেছন বেঁকিয়ে হাঁটা আর বড়-বড় বাতেল্লা। আপস্টার্টরা জেনারালী তাই-ই হয়।

কুসি বুঝল বব আজ খুব বেশী খেয়েছে। নইলে এমন করে নিজেকে এক্সপোজ করত না ওর কাছে। কুসি ভালো-ফালো কাউকেই বাসেনি : বাসে না : বাসবেও না। একমাত্র নিজেকে ছাড়া। কুসি গ্ল্যামার চায় জীবনে। কারো সঙ্গেই ফেঁসে যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওর। মডেলিং-এর মাধ্যমে লাইমলাইটে এসে ও শেষমেষ ফিল্মে যেতে চায়। কুসি অনিমেষের মতো, ববের মতো বহু ছেলেকে মই হিসেবে ব্যবহার করেছে। এবং করবে। যতদিন মধু থাকে। মৌমাছি ওড়ে। ততদিন। শী উইল লিভ হার ওওন লাইফ ইন আ গ্রান্ড ওয়ে।

বব হঠাৎ উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। ও কিছুই পরে নেই। ওকে একটা শিম্পাঞ্জীর মতো দেখাচ্ছিল। কুসি মুখ ঘুরিয়ে নিল। বব-এর পা দুটো একটু বেঁকা—ভেতরের দিকে।

বব বলল, লেটস হ্যাভ আ নাইটক্যাপ। বলেই সেলার খুলে দুটো বড় হুইস্কী ঢালল। স্মাগলারদের কাছ থেকে কেনা। সস্তায় পায়।

এক চুমুক দিয়ে বলল, আহ্, নাথিং লাইক আ রিয়্যাল টি-সি-এল।

কুসির ড্রিঙ্কটা কুসির হাতে ধরিয়ে দিয়ে কুসির কোমর বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে খাটে এল। ড্রেসিং টেবলের বাতি নিবিয়ে দিল। বিছানার মাথার কাছের

ফিকে নীল ইনস্টালাইট বালবটা জ্বলতে লাগল শুধু।

বব বলল, আমাকে তোমার কেমন লাগে?

কুসি ববের টনসিলের উপরে নাক ঘষে দিল। কথা বলল না।

—সে সামথিং।

কুসি বব-এর বুকের চুলে বিলি কাটল।

বব বলল, হোয়াই আর য়্যু সো কোয়ায়েট কুসি, মাই পুষি ক্যাট?

—অ্যাজ ইফ য়্যু ডোন্নো।

ভুরু নাচিয়ে, সিঁদুরে আম দুলিয়ে কুসি কালবৈশাখীর মতো বলে উঠলো।

কুসি ওর ডান হাতের সুন্দর আঙুলগুলো বব নন্দীর তরমুজের মতো পেটে বোলাতে-বোলাতে বলল, বব তুমি জেনুইন এক নম্বর।

বব উঃ করে উঠল। বলল, সুড়সুড়ি লাগছে।

বব শুধোলো, অনিমেষ? অনিমেষও জেনুইন?

—ও দু নম্বর। ভেজাল।

বব বলল, ওকে আমি সহ্য করতে পারি না।

—কেন?

—ওর ধারণা সত্যজিৎ রায়ের পর ও-ই কোলকাতার একমাত্র ইনটেলেকচুয়াল। ও যা বোঝে আর কেউ বোঝে না। গান, ছবি, ফিল্ম, কমার্সিয়াল আর্ট।

কুসি ববের বুকের উপর উপুড় হয়ে আধ-শুয়ে বলল, এতই যদি বোঝে তা ও দাড়ি রাখে না কেন?

বব বলল, ফানী! ও একটা দাড়িহীন, নন্-কম্যুনিস্ট, নন-কমিটাল সিলী ইনটেলেকচুয়াল।

তারপর বলল, ওর বাবা তেলেভাজা বিক্রী করত রাস্তায় বসে—ওর কোনো পেডিগ্রী নেই।

—ও কি পিকিনীজ কুকুর যে পেডিগ্রী থাকবে?

—ওয়াট ওজ ইয়োর ফাদার? হঠাৎ কুসি শুধোলো।

—দ্যাটস বিসাইডস দ্য পয়েন্ট। আমার বাবা মিল-ওনার ছিলেন। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্।

—কিসের ইণ্ডাস্ট্রি? কুসি আবার শুধোলো।

আজ কুসি ববের রেসপেকটিবিলিটির খোসা ছাড়াবে, নিজেকে ওর ক্লিওপেট্রা বলে মনে হচ্ছিল। ববের সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের ন্যাবা-রঙা বেলুনে আজ ও পিন ফোটাবে। এবং আজ রাতেই। বব আজ অনেক খেয়েছে, কুসি এই সুযোগ ছাড়বে না।

ববের ধুন্কি এসেছিল।

বব সিরীয়াস গলায় বলল, আদর খাওয়ার সময় অন্য কথা শুনতে নেই, বলতে নেই। কনসেনট্রেট করতে হয়। কনসেনট্রেশান নষ্ট হয়ে গেছে বলেই বাঙালির কিছু হলো না; হবে না।

কুসি ববের চুলভরা বুকে নোটারী পাবলিকের সীলের মতো বাদামী দুদুতে একটা চুমু খেল চুঃ শব্দ করে।

চুমু খেয়েই বলল, বলো না, কিসের মিল ছিল? কারখানা কিসের?

—সর্ষের তেলের।

—কতগুলো মেশিন ছিল?

—মেশিন ছিল না, বলদ ছিল।

—বলদ? মাই গুড্‌নেস! ব্রিড্ করতেন তোমার বাবা? কতগুলো ব্রিড্ করেছিলেন?

—চারটে।

কুসি শুধোলো, মাত্র চারটে?

বব বললে, হ্যাঁ, ঘানিতে চারটে বলদই যথেষ্ট।

কুসি ববের অন্য দুদুতে চিমটি কেটে বলল, আই লাভ য়্যু অল দ্য মোর। তুমি ওয়াণ্ডারফুল। ডার্লিং।

বব চমকে উঠে বলল, কেন? কেন? হাতের গ্লাস থেকে হুইস্কী চল্‌কে পড়ল।

—কারণ, তুমি রিয়্যালি এক নম্বর। সত্যি কথা বল, দেরী করে হলেও বলো তুমি। অনি হিপোক্রিট, চালিয়াৎ, ইম্‌পোসটার; দু' নম্বর।

বব এক ঢোকে নাইট-ক্যাপটা হাত বাড়িয়ে শেষ করে ফেলে গ্লাসটা খাটের পাশের সাইড-টেবলে নামিয়ে রাখল।

তারপর কুসিকে পাশ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, নাথিং রিয়্যালি ম্যাটারস্। একসেপ্‌ট...

—ওয়াট? কুসি শুধোল।

বব আমেরিকান কায়দায় শ্রাগ করে বলল, ইট ডাজ্‌ন্‌ট ম্যাটার। হোয়ার য়্যু কাম ফ্রম সোস্যালী: ইট অল ম্যাটারস্ হোয়ার ডু য়্যু গো! তুমি সমাজের কোন্ তলা থেকে এসেছ, তাতে কিছুই এসে যায় না, তুমি কোন্ তলায় পেঁছলে সেটাই বড় কথা।

কথাটা কুসির খুব ভাল লাগল। কুসি কোথা থেকে এসেছে, কুসিই জানে। কিন্তু সে কোথায় যাবে, অ্যাট লিস্ট যেতে চায়, কুসি তা-ও জানে।

কুসিরও ধুন্‌কি এলো।

হুইস্কীটা ভাল।

বব আলোটা নিভিয়ে দিলো।

বব কুসির শরীরের ডিওডোর্যান্ট-এর গন্ধে সর্ষের খোলের গন্ধ পেলো। বব-এর বাবার হুঁকো হাতে, ফতুয়া-পরা চেহারাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। কিন্তু খোলের গন্ধ কেন?

ডিওডোর্যান্টটা বোধহয় মাস্টার্ড-বেসড। বব ভাবল, কালই কপিরাইটারকে বলবে এ নিয়ে। দারুণ বিজ্ঞাপন হবে।

শ্যাম মালহোত্রার পার্টি শেষ হয়ে গেল প্রায়।

অনিমেষ সাহেবী কায়দায় হ্যারী বেলাফন্টের গান গাইতে গাইতে হঠাৎ একেবারে দিশী কায়দায় থেবড়ে বসে বমি করে ফেলেছিল কার্পেটে। একজন তরুণ কবি হিসি করে ফেলেছিলেন বেহুঁশ হয়ে। আর্যপ্রয়োগ। এই কবিকেই অনিমেষ পার্টিতে বলেছিল ওদের ক্লায়েন্ট হতে। বলেছিল, বিজ্ঞাপনই কবি সাহিত্যিক তৈরী করে, দল, ফলোয়িং; পাবলিসিটী—আজকাল লেখার গুণফুন ইমম্যাটিরিয়াল হয়ে গেছে। আইদার এ্যাডভার্টাইজ ইওরসেল্ফ অর পেরিশ! অনিমেষকে এবং সেই কবিকে ট্যাক্সিতে তুলে দিল শ্যামের দারোয়ান। তরুণ কবিটি ট্যাক্সির সীটে আবারও বমি করলেন। ট্যাক্সিওয়ালা মা-বাবা তুলে গালা-গালি দিল। অনিমেষ জড়িয়ে জড়িয়ে তাকে বলল, সবাই তো বাওয়া একই হোমোসেপিয়ান্ থেকে এয়েছি—এত রাগারাগি কিসের?

বাড়ি পৌঁছে শিবেনবাবু বিজাতীয় পোশাক ছেড়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন: শোওয়ার সময় ওঁর লুঙি না-পরে শুলে আরাম হয় না। দিশী সংস্কৃতিতে এমন জিনিস আর দুটি নেই। পরতে খুলতে ফারস্ট ক্লাস।

মাধবীলতার এক ঘুম হয়ে গেছিল। শুক্রবার ওঁদের আদরের দিন। মাধবী শিবেনবাবুর চেয়ে পনেরো বছরের ছোট। মাধবীর যে মাঝে মাঝে কী হয়! বাঘিনী হয়ে ওঠেন।

মাধবী ঘুমিয়ে-টুমিয়ে গায়ে জোর করে শিবেনবাবুর দিকে এক গড়ান্ দিয়ে এগিয়ে এলেন।

মাধবীর মনকে অন্যদিকে ছুপ্কি দেওয়ার জন্যে উনি বললেন, তোমার সেই ব্রেসলেট্ বানানোর কি হলো?

—বানিয়ে আর দিলে কই? মাধবী বললেন।

তারপরেই বললেন, স্টেট ব্যাঙ্কের লকার থেকে টাকা নিয়ে কালই অর্ডার দিয়ে দেবো?

শিবেনবাবু উঠে বসলেন। হুইস্কীর নেশা ছুটে গেল। রেগে বললেন, তোমার এতবড় বিজনেসম্যান কেউ-কেটা দাদাকে বললাম যে, কমিশান-টমিশান দেখিয়ে তোমার নামে ইনকাম-ট্যাক্সের ফাইল বানাই একটা। তা নয়। ভারী দাদা! পার্টির টিকিটও তো দিলেন না।

মাধবী বললেন, আহা! আমার আপন দাদা যেন। আপন দাদা হলে কি আর এমন পায়াভারী হত?

একটু চুপ করে থেকে শিবেনবাবু বললেন, আমার ওয়েল্থ ট্যাক্সের রিটার্নে কোন গয়না দেখানো নেই। তোমার অল্‌রেডি যা গয়না আছে, তার দাম কত হতে পারে? তোমার যে ফাইলই নেই! সেই ত মুশকিল।

—কত আর হবে? তিরিশ হাজার। মাধবী বললেন।

—ইমপসিবল্। আজকের দিনে? মাত্র তিরিশ হাজার! আহা! কস্ট নয়;

ভ্যালু। আজকের দিনের দাম।

মাধবী একটু ভেবে, কোলবালিশটার ওপর দু হাত ভর দিয়ে শুয়ে বললেন, তা লাখখানেক হবে।

—সর্বনাশ! তাহলে আরও কিনবে কি করে?

—কেন? কিনব না কেন? যখন বিয়ে হয়েছিল তখন এর দাম কত ছিল? কোন্ বাঙালীর মেয়ের বিয়ে হয় গয়না ছাড়া? তোমাদের ইনকামট্যাক্স কমিশনার-দের বিয়ের সময় কি তাঁদের স্ত্রীরা গয়না পাননি, না বিধবার মতো হাত-খালি, গলা-খালি করে তাঁদের বিয়ে হয়েছিল? যে-আইনের কোনো মানে নেই, সে আইন করা কেন?

—আহা! তুমি বোঝো না। শিবেনবাবু বললেন। আইন—আইন। তারপর বিরক্তির গলায় বললেন, তোমার দাদাকে বলো না কেন? তাঁরাই ত দেশের আইন বানান।

—অত বুঝি না। বুঝতে চাইও না।

—দু নম্বরে কেনার বিপদ আছে। না বুঝলে চলবে কি করে?

—দু নম্বর কি?

—টাকা টাকা। দু নম্বর টাকা। অন্যের দু নম্বর সামলাতে পারি, কিন্তু আমারটা সামলাবে কে?

মাধবী মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, অত আমি জানি না। দেবে কিনা বল? একটা গয়না বানাব, তার দু নম্বর, এক নম্বর যত বাগড়া।

শিবেনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোঝ তো না, কত ধানে কত চাল। সুখী বেড়ালটির মতো দিন কাটে।

—খবরদার! মাধবী বললেন।

শিবেনবাবু তাড়াতাড়ি আপোস করে বললেন, ঠিক আছে। কিন্তু ক্যাশ-মেমো নিজের নামে নিও না। আর তোমার মাকে দিয়ে একটা এফিডেবিট্ করিয়ে রাখতে হবে যে, তোমার দিদিমা ওটা তোমাকে দিয়ে গেছিলেন।

মাধবী বললেন, মরে যাই! দিদিমা তো মরার সময় আমাকে একটা পেতলের নথ ছাড়া কিছুই দেয়নি। যাকিছু সবই তো ছোট মাসী আর তার মেয়েদের দিয়ে গেল। মা এ কথা বলতে যাবেন কেন?

—আহা! হলো। সত্যি সত্যি দেওয়ার কথা কে বলছে? যা বলছি, তা শোনো না। শিবেনবাবু বললেন।

—আমি কিছু শুনতে চাই না। অবাধ্য গলায় মাধবী বললেন।

—কিছুই বোঝো না তুমি, বিরক্ত হয়ে শিবেনবাবু বললেন। দু নম্বরের যে কত বিপদ তোমরা কি বুঝবে? টাকা তো আর কামাতে হয় না। আগেকার দিনে ডাকাতি হতো—তাও তো রাতে—এখন দিনে-দুপুরে ডাকাত পড়ছে—কখন যে কার বাড়ি পড়ে ঠিক নেই। ইনকাম-ট্যাক্সের রেড্ কাকে বলে জানো না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। গ্যাংগ্রীন্ হয়ে যাবে।

—অত-শত কথার আমার দরকার নেই। তোমাকে ব্রেসলেট দিতেও হবে না। দু নম্বর তিন নম্বর আমাকে বোঝাতেও হবে না। মাধবী রেগে বললেন।

শিবেনবাবু স্বগতোক্তির মতো বললেন, আমার কি এক নম্বর এত আছে যে গয়না বানিয়ে দিতে পারি? দু নম্বরেই একমাত্র দিতে পারি। কিন্তু তাও দু নম্বরই বা জমে কোথায়? যত্র আয় তত্র ব্যয়। সাবধান হবার দরকার নেই?

মাধবী মুখ ফিরিয়ে চুল ছড়িয়ে শুয়েছিলেন।

শিবেনবাবু বললেন, ওগো শুনছো?

মাধবী রেগে বললেন, শুনছি না; শুনব না। আমি তোমার এক নম্বর বউ। আমাকে এক নম্বর দিলে দাও, নইলে দিও না। সবিতার বাড়ি যাতায়াত একটু কমাতে হবে।

শিবেনবাবু মুখে বললেন, বাঁদিকের বুকটা ব্যথা ব্যথা করছে। অনেকদিন কার্ডিওগ্রাফ করা হয়নি।

মাধবী বললেন, মরো তুমি। মরলে বাঁচি।

শিবেনবাবু ভাবলেন, পৃথিবী কী নিষ্ঠুর। ভেবে পাশ ফিরে শুলেন।

ট্রাইব্যুনালে পেঁছুতে একটু দেরী হয়ে গেছিল শিবেনবাবুর। কজলিস্টে দেখলেন বি বেঞ্চে ও'র কেস পাসড-ওভার হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে এখন। করিডর দিয়ে হেঁটে বার লাইব্রেরীর দিকে আসছেন, হঠাৎ বড় হট্টগোল শুনলেন। একটা কোর্টরুমের মধ্যে হৈ চৈ হচ্ছে। অনেক উকিল। চার্টার্ড অ্যাকাউনট্যান্ট কৌতূহলের সঙ্গে দরজার সামনে অথচ পার্টিশানের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকিঝুঁকি মারছেন।

একটু পরই নগেনবাবু হন্তদন্ত হয়ে কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। অনেকদিন পর শিবেনবাবুর দেখা হলো নগেনবাবুর সঙ্গে—তাঁর এককালীন সিনিয়র। নগেনবাবুর চেহারাটা বড় ভেঙে গেছে মনে হলো। সবাই তাঁকে ঘিরে ধরলেন। কি হলো নগেনদা, কি হলো?

নগেনদার কপালের পাশের চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেছে। মেজাজও খিটখিটে। কোটের হাতার কাছটা ছিঁড়ে রয়েছে।

—অ্যাকাউন্ট্যান্ট মেম্বার অত চটে গেলেন কেন? একজন শুধোলেন।

নগেনদা বললেন, ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেসেন্টিটিভের অ্যাডজোর্নমেন্ট মোশানে অবজেক্ট করেছিলাম। এই নিয়ে চারদিন হলো। প্রথম দিন ডি. আর বললেন, রেকর্ডস পাঠাননি ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। ওয়ান ফর্টি সেভেন ওয়ান-এর কেস। পরের বারও তাই। তারপরের বার রেকর্ডস এসে পেঁছল, কিন্তু ডি. আর বললেন, পড়ার সময় পাননি।

—আজ কি হলো? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—আজকে যে ডি. আর এতদিন ছিলেন এই বেঞ্চে, তিনি ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছেন। যিনি ডি. আর ছিলেন তিনি ফাইল দেখেননি। অতএব আজও অ্যাডজোর্নমেন্ট। পিসীমা অম্লানবদনে অ্যাডজোর্নমেন্ট গ্র্যান্ট করে যাচ্ছেন যেন মামা বাড়ির বাগানের ফল। আমি আপত্তি করতেই তুলকালাম বেঁধে গেল।

একটু থেমে নগেনদা বললেন, কেন? আমাদের কি সময়ের দাম নেই? এই গত তিন মাসে চারবার অ্যাডজোর্নমেন্ট হলো অথচ প্রত্যেকবার রাত জেগে ফাইল পড়লাম। পেপারবুক রঙীন পেনসিল দিয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে রামধনু হয়ে গেল। মক্কেল কী প্রতিবার ফি দেবে? আজ সকালে ডাইং-ক্লিনিং থেকে আমার কোটটা আনা হয়নি বলে তোমাদের বৌদির সঙ্গে চুলোচুলি ব্যাপার—না খেয়ে-দেয়ে ছুটতে ছুটতে ছেঁড়া কোট ঝেড়ে-ঝুড়ে লোড শেডিং-এর মধ্যে বাষট্টি বছর বয়সে হেঁটে সাততলায় উঠলাম—আর কাণ্ডটা দেখেছো! অ্যাডজোর্নমেন্ট যদি ডিপার্টমেন্ট নেবেই, তাহলে আমাদের একটু আগে জানাতে কি হয়? আগের দিন একটা ফোন করলে কি হয়? ভদ্রতা বলে কোনো জিনিসই কি আর সংসারে নেই? আর ও'রা কেউ কেউ নিজেদের কী ভাবেন? তাঁরা কি হাতে মাথা কাটবেন?

সকলেই বললেন, সত্যিই তো। সত্যিই তো।

গোপেন ঘোষ বললেন, আপনার মাথা বড় গরম নগেনদা। বেঞ্চকে চটিয়ে লাভ কি? ও'দের চটিয়ে কি রিলিফ পাবেন? মক্কেল মারা যাবে। অনেকদিন তো লাঠিবাজী করলেন, এবার একটু প্র্যাকটিকাল হোন। এরকম তো আমাদেরও

রোজই হচ্ছে। আমরা হেসে বাঁও করে "অ্যাজ য়্যু প্লিজ ইওর অনার" বলে চলে আসছি। ঝগড়া করতে হয় ট্রামে করুন, বাসে করুন, রকে বসে করুন, নইলে বৌদির সঙ্গে করুন, এখানে ঝগড়া করতে আছে? রুজির ব্যাপার যেখানে।

নগেনদা লাইব্রেরীতে বসে পড়ে বললেন, তা বলে ন্যায়-অন্যায় নেই? তোমরা কেউ প্রতিবাদ করো না বলেই তো এরকম হয়। ছিঃ ছিঃ, রুজির ব্যাপার বলে কি তোমাদের সত্যি কথা বলার সাহস থাকবে না? এই রোজগারের ভাত খাও কি করে তোমরা? তোমরাই হলে নোবল প্রফেশানের মেম্বার, তোমরাই দেশের ভবিষ্যৎ। রুজিটাই কি জীবনের সব? "অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে"। তোমরা প্রত্যেকে যদি ন্যায্য কথা বলতে তাহলে কি এমন অবস্থা হতে পারত?

নগেনদার বয়স হয়েছে। কোর্টরুমের মধ্যে কি ঘটেছিল তা শিবেনবাবু জানেন না, কিন্তু ওঁকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল।

রামবাবু বললেন, কফি খান নগেনদা, উত্তেজিত হবেন না।

নগেনদা বললেন, আমি ঐ ব্যাপারে উত্তেজিত হইনি। কিন্তু তোমাদের প্রতিদিনকার নিরুত্তাপ সর্বংসহ মনোভাব আমাকে সত্যিই মাঝে মাঝে উত্তেজিত করে তোলে। তোমরা যে স্বাধীন দেশের লোক কে বলবে?

তারপরই—আমি চললাম, বলেই নগেনদা হঠাৎ উঠে পড়ে লিফট-এর দিকে চলে গেলেন।

নগেনদা চলে যেতেই, বার-লাইব্রেরীতে কফি এলো। কাপে কাপে ঢালা হলো। কফি খেতে খেতে গোপেন ঘোষ শ্লেষের সঙ্গে স্বগতোক্তি করলেন, হুঃ। ডন্ কুইকসো—ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে যেখানেই উইন্ডমিল দেখছেন সেখানেই ঘোড়া থেকে নেমে তরোয়াল চালাচ্ছেন। যেন একমাত্র অবিচার ট্রাইব্যুনালে অ্যাডজোর্নমেন্টের ক্ষেত্রেই হচ্ছে। চারিদিকে অবিচার আর নেই। বিচারটা এখন কোথায়? কোন্ স্টেজে? জীবনের মারাত্মক মারাত্মক ক্ষেত্রে সব অবিচার মুখ বুজে সয়ে হঠাৎ এখানে এসে এত এত আস্ফালন কেন? নগেনদার কোনো সেন্স অব প্রপোরশান নেই।

শিবেনবাবু কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, এই জন্যেই প্র্যাকটিস খারাপ হয়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নইলে লোকটার কত গুণ ছিল। এ্যাসিমিলেশন অফ ফ্যাকটস, প্রেজেন্টেশান, ডিমেনুর, প্রফেশনাল অনেস্টি দাদার সবই ছিল—অথচ এই ব্যবহারের জন্যে...।

শান্তু ঘোষ বললেন, ব্যবহারটা খারাপ কি করলেন? টাইম এ্যান্ড এ্যাগেইন নন্শ্যালান্টলি ডিপার্টমেন্ট অ্যাডজোর্নমেন্ট চাইলে তা পেয়ে যাবে? আর আমরা সাতদিন আগে পিটিশান দিলেও তবুও আপীলের দিন ধড়াচূড়া পরে এসে মেন্শান্ করতে হবে। যেন আমরা ফাঁসীর আসামী, আমাদের সুবিধে-অসুবিধে নেই, আমরা বাইরে যেতে পারি না, শরীর খারাপ হতে পারে না আমাদের? তারপরও অ্যাডজোর্নমেন্ট পাওয়া যাবে কি যাবে না ঠিক নেই—এটা কি ন্যায্য বিচার হলো?

গোপেনবাবু বললেন, আবার সেই ন্যায্য বিচার? ন্যায্য বিচার আছেটা কোথায়? প্র্যাকটিক্যাল হতে হয় বাবা, প্র্যাকটিক্যাল হতে হয়। যে যুগে বাস করছ সেই যুগের মতো নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে। তাছাড়া অন্যায় বললে কি হবে? মেম্বাররা কী অ্যাডজোর্নমেন্ট দেন না তোমাদের? তোমরা বড় নিন্দুক।

তাছাড়া ডিপার্টমেন্টের অসুবিধের কথাটাও বিবেচনা করো। আদার ম্যানস পয়েন্ট অফ ভ্যিউ যে বিচার না করে তাকে আমি উকিলই বলি না। ও'দের অসুবিধে কি আমাদের চেয়ে বেশী নয়? অত মেজাজই যদি দেখাবে তাহলে প্র্যাকটিস করতে আসা কেন?

শান্তু ঘোষ রেগে বললেন, প্র্যাকটিস করতে আসা মানে কি মান-সম্মান ন্যায়-অন্যায় বোধ সব বাড়িতে রেখে আসতে হবে? অন্যায় হলে তার প্রতিকার হবে না? আপনাদের মতো চামচেগিরি করা লোকদের জন্যেই তো এই অবস্থা। সকলে মিলে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় তা বলতে কি আমরা পারি না? যদি সকলেরই নগেনদার মতো গাটস্ থাকত তাহলে এমন কখনোই হতো না।

জয়ন্ত চৌধুরী বললেন, গাটস-ফাট্স মশাই ও পাঁঠার পেটেই পাওয়া যায় আজকাল। পয়সা কামাতে এসে এত ফুটানী মারলে চলে না। একে মায়ে রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা। দুবেলা সংসার চালাতে ছেলেমেয়েকে স্কুলে পাঠাতে প্যান্ট খুলে যাচ্ছে, তার আবার বড় বড় বাতেল্লা। আপনি বাঁচলে বাবার নাম।

শান্তু ঘোষ বললেন, যাইই বলুন আর তাই-ই বলুন, আমাদের বারে কিন্তু একটি মানুষই আছেন যিনি অন্যায়কে মেনে নেন না কোনো অবস্থাতেই। এই নগেনদা।

খগেনবাবু বললেন, নগেনদার বদনামও আছে যে, তিনি বেঞ্চকে মিসলিড করেন, এ্যারোগ্যান্ট্ উনি বড্ড। আননেসেসারিলি ইনসাল্ট করেন মেম্বারদের, বিনা কারণে ভদ্র ও বিনয়ী ডি-আর-দেরও খোঁচা দিয়ে কথা বলেন।

শান্তু বলল, হয়তো বলেন, হয়তো করেন, সেরকম করা বা বলা অন্যায়—কিন্তু লোকটা একটা এক্সেপ্শান। যাই বল আর তাই বল, গ্রেশামস ল ইজ ইন এ্যাপ্লিকেশান হিয়ার। ব্যাড মানি ড্রাইভস্ অ্যাওয়ে গুড মানি, বুঝলে ভায়া! নইলে নগেনদার মতো লোকের প্র্যাকটিস কমে যাচ্ছে কেন দিনকে-দিন? আমাদের মধ্যে একজনও কি আছি যিনি কোয়ালিটিতে নগেনদার ধারে-কাছে আসি? আমরা বেশীর ভাগই তো দু নম্বরী উকিল।

—দু নম্বরী উকিল মানে কি? শিবেনবাবু বললেন।

গোপেন ঘোষ বললেন, অবশ্য একথা ঠিক যে, নগেনদা লোকটা খাঁটি, পারফেক-শনিস্ট। হয়তো একটু দুর্মুখ, শর্ট টেম্পারড—কিন্তু, হি ইজ আ লোন বুল এ্যালিফ্যান্ট ইন দিস ওয়াইল্ডারনেস্ অব দ্য টেমড্ এ্যান্ড দ্য টিমিড।

—অবজেকশান, অবজেকশান। এ কী ভাষা?

গোপেনবাবু বললেন, সরী, আই উইথড্র। আমি কাউকে হার্ট করতে চাই না। চাইনি। কিন্তু সত্যি কথা বলো তো তোমরা? আমরা কি মক্কেলের কেস যেনতেন প্রকারেণ জেতার জন্যে অনেক সময় নিজেদের হিউমিলিয়েট করি না, হাকিমদের কাছে, মক্কেলদের কাছে পয়সার জন্যে? মাথা নীচু করি না, অন্যায় সহ্য করি না? এ তো ভিখারীর মতো মনোবৃত্তি। মাথা উঁচু করে থেকেও স্পেডকে স্পেড বলেও তারপরেও আপীল জেতার মতো এলেম আমাদের নেই কেন? লজ্জাটা কি আমাদেরই নয়? সব সময় কি মাথা উঁচু করে রোজগার করতে পারি আমরা?

শান্তু বলল, সেকথা একশোবার সত্যি। এই দু নম্বরের বাজারে নগেনদাই একমাত্র এক নম্বর। লোকটার মধ্যে ভণ্ডামি নেই, লুকোচুরি নেই। প্র্যাকটিস যে খারাপ হয়ে যাবে এতে আর আশ্চর্য কি? এখন দেশময় দু-নম্বরী মক্কেল আর দু-নম্বরী উকিল। এক নম্বরীরা তামাদি হয়ে যাচ্ছে।

রাখোহরিবাবু বয়স্ক উকিল। একসময়ে অনেক রাখন্তি ছিল তাঁর। এলেমদার লোক। বহুদিন হয়ে গেছে তাঁর এই বারে। পান খাচ্ছিলেন জর্দা দিয়ে। বয়স, সত্তরের উপর হলো কিন্তু চেহারাটি পাকা আমের মতো। মাথার চুলে পাক ধরেনি একটুও। খুব আস্তে আস্তে মিষ্টি করে কথা বলেন। জর্দার গন্ধ ছড়িয়ে বললেন, প্র্যাকটিস কি শুধু বিদ্যা দিয়ে হয় হে? শুধু মেধা দিয়েও হয়? পালকিওয়ালার বইয়ে কী সবই লেখা থাকে? প্র্যাকটিস হয় অনেক গুণে এবং কপালে। ভগবানের আশীর্বাদে। কার হবে কার হবে না কেউই বলতে পারে না। তবে, বিনয় হচ্ছে সবচেয়ে বড় গুণ। তোমরা পালকিওয়ালাকে দ্যাখো না চোখের সামনে? আসেন তো মাঝেমধ্যে। ভারতবিখ্যাত অত বড় কাউনসেল, অত বড় পণ্ডিত। অথচ কী বিনয়ী, কী নম্র। দেখেও তো নগেন শিখতে পারে। ওর ধারণা যে বেশীর ভাগ জজেরা, মেম্বারেরা সব গাধা—ওই-ই একমাত্র বুদ্ধিমান। ওর চরিত্রে সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, ও নির্বুদ্ধিতা, ইমপারফেকশান বে-আক্কেলে ব্যবহার কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না।

তারপর মুখে আর একটু জর্দা ফেলে বললেন, এ-যুগই হচ্ছে আক্কেল গুড়ুমের যুগ। আক্কেল বাঁচিয়ে রেখেছো কি ধ্বসেছো। নিঃশব্দে কবর হয়ে যাবে। এ-সবের দাম ছিল ব্রিটিশ আমলে। তোমরা যে-যাই বলো না কেন, দেশ স্বাধীন হয়ে অনেক ব্যাপারে আমাদের অবনতি হয়েছে। ক্ষতি হয়েছে ন্যাশনাল ক্যারেকটারের। এ আমার দৃঢ়বিশ্বাস। নিজে-চোখে দেখা অভিজ্ঞতা।

এমন সময় করিডরে একটা ঝড়ের আওয়াজ শোনা গেল, হাইকোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে ডাকসাঁইটে উকিল আসছেন। ছ'ফিট লম্বা ধবধবে ফর্সা, মাথাভর্তি চুল, চশমাহীন চোখ। পিছনে সলিসিটরের লোক, মক্কেলের ট্যাক্সেশান ডিপার্টমেন্টের লোক, অডিটরের লোক।

উনি বড় ব্যস্ত কাউনসেল। যেখান দিয়ে যান, ঝড়ের মতো দোলা লাগিয়ে যান চারপাশে।

উনি এসেই কজ লিস্টটা তুলে নিয়ে দেখলেন তারপর সলিসিটরের লোককে বললেন, এ কি! লিস্টের একেবারে শেষে কেন? আমার কি এত সময় আছে এখানে বসে নষ্ট করবার? করো কী তোমরা? অফিসে বলে-কয়ে ইনফ্লুয়েন্স করে কেসটা লিস্টের উপরে আনতে পারো না? এসব একটু করতে হয়। ওয়ার্থলেস। একেবারে ব্যাকডেটেড। ইউ ডু নট নো এনীথিং এ্যাবাউট ওয়ার্মিং-আপ দ্য ব্যারেলস্।

বলেই চার-হাজারী ঘড়ি দেখলেন, বললেন, সাড়ে-বারোটা বাজে। লাঞ্চের আগে কেস ওঠার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

মক্কেলের লোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, স্যার এখানে গরমে বসে কি করবেন? ক্যালকাটা ক্লাবে চলুন।

সিনিয়র কাউনসেল হাসলেন। বললেন, মন্দ বলোনি, কি খাওয়াবে? পিংক জিন?

ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি ভারতবিখ্যাত কোম্পানীর ট্যাক্সেশান ডিপার্টমেন্টের বড় সাহেব। সিনিয়র কাউনসেলকে নিয়ে একটু এনটারটেন্ করবেন এ তো সৌভাগ্যের কথা।

সিনিয়র কাউনসেল বললেন, এমন আর কি? খরচাও তো পেয়ে যাবে—অ্যাজ বিজনেস একসপেণ্ডিচার। গুজরাট হাইকোর্ট তো বলেই দিয়েছে।

রাখোহরিবাবু বললেন, যতক্ষণ না ক্যালকাটা হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট এগেইনস্টে যাচ্ছে ততক্ষণ ঠেকাচ্ছে কে? আফটার অল্, আমাকে এরা যদি খাওয়ান এটা কি এনটারটেনমেন্ট? আমি গাউন পরে কি এখন বাড়িতে বসে কলাই-য়ের ডাল আর পোস্তর তরকারী খাবো? দিস একসপেনডিচার ইজ সার্টেন্লি ইন্সিডেন্টাল টু বিজনেস।

মক্কেলের লোক বললেন, চলুন স্যার, আমি একজন জুনিয়র রেখে যাচ্ছি। যদি বাই-চান্স লাঞ্চের আগে কেস ওঠার সম্ভাবনা থাকে তাহলে ক্লাবে ফোন করে দেবে। ক্যালকাটা ক্লাব থেকে আসতে তো পাঁচ মিনিট লাগবে।

ঝড় চলে গেলে, লাইব্রেরী আবার ঝিমিয়ে পড়ল। পাখাটা কিট্কিট্ আওয়াজ করতে লাগল, সিগারেট ধরানোর জন্যে দেশলাই জ্বালানোর খস্-স্-স্ আওয়াজ।

গোপেন ঘোষ বললেন, স্যারের সবই আছে, কিন্তু কি যেন নেই।

শান্তু বলল, ডিমেন্যুর।

গোপেন ঘোষের মনে পড়ে গেল, রামবাবু ঐ সিনিয়র কাউনসেলের সঙ্গে এক-সঙ্গে পড়তেন। পাছে সিনিয়রের কাছে চুক্লি করেন রামবাবু, তাই তাড়াতাড়ি বললেন, যাই বলো আর তাই বলো নাথিং সাক্সীডস্ লাইক সাক্সেস।

রাখোহরিবাবু বললেন, ছাত্র ভালো ছিল বরাবর।

শান্তু বলল, বড্ড চেঁচান।

গোপেন ঘোষ বললেন, ভালোই তো। এখন মাঝে মাঝে যেরকম সব বেঞ্চ দেখি, তাদের একটু ওভার পাওয়ার করা দরকার। পাণ্ডিত্যে তো বটেই, হি ক্যান ওভার পাওয়ার দি বেঞ্চ বাই দ্য শীয়ার স্ট্রেনথ্ অফ হিজ ভয়েস অ্যাজ ওয়েল।

শান্তু বলল, কিন্তু অপেরা-সিঙ্গিং আর অ্যাডভোকেসী কি এক জিনিস?

রাখোহরিবাবু আরও একটা পান মুখে দিয়ে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বললেন, ফুক্-ক্! শান্তু, তুমি বড় বাচাল।

এমন সময় শিবেনবাবু যে মক্কেলের আপীলে আজ এসেছেন সেই মক্কেল এসে বার লাইব্রেরীর দরজায় দাঁড়ালেন। ফিসফিসে গলায় ডাকলেন, শিবেনবাবু।

শিবেনবাবু লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে করিডরে এলেন।

বললেন, কী ব্যাপার?

—আজ কেস করব না।

—কেন?

—আমি জেতার ব্যাপারে সিওর না হয়ে কেস করব না।

শিবেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, কি করতে চান আপনি? আপনাকে তো আগেই বলেছি যে, কনট্রাকট্ করে কেস আমি করি না। আমি যতখানি পারব, করব। কেস হওয়ার আগে হারা-জেতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলি না কাউকে। বলা সম্ভবও নয়।

—রাগ করবেন না শিবেনবাবু। আপনার পুরো ফীস্ আমি দিয়ে দিচ্ছি। আপনি শুধু অ্যাডজোর্নমেন্টটা নিয়ে নিন।

এ লোকটি শুধু এই ট্রাইব্যুনালের জন্যেই শিবেনবাবুর কাছে এসেছিলেন। অথচ শেষ মুহূর্তে এমন ব্যবহারের কারণ বুঝতে পারলেন না উনি।

শিবেনবাবু বললেন, ব্যাপারটা কি? খুলে বলবেন?

মক্কেল বললেন, স্যার আমি সিওর সোর্স্ বের করেছি।

—জেতার?

—হ্যাঁ।

—কি রকম?

—চট্টখণ্ডীবাবুকে চেনেন? মক্কেল চোখ নাচিয়ে বললেন।

—না। অবাক হয়ে শিবেনবাবু বললেন।

—ঐ যে, বসে আছেন। বলে, দূরে করিডরের বেঞ্চে বসে-থাকা এক ভদ্রলোককে দেখালেন মক্কেল। ছোকরা উকিল, জামাকাপড়ের বাহার খুব, কয়েক মাস হলো মাত্র এখানে দেখছেন মাঝে মধ্যে, মুখ চেনা। নাম জানতেন না শিবেনবাবু।

শিবেনবাবু শুধোলেন, উনি সিওর জেতার কথা কি করে বলছেন?

মক্কেল একটু কেশে বললেন, একজন মেম্বার আছেন, তিনি তাঁর গুরুভাই। ও'র গুরু বলে দিয়েছেন সেই মেম্বারকে যে, তোমার গুরুভাইকে সাহায্য কোরো। সে যে-কেস্‌ই হোক। এ গুরুবাক্য। গুরুবাক্য কি কোনো সৎ-শিষ্য লঙ্ঘন করতে পারে?

—সেই মেম্বার? শিবেন শুধোলেন।

—তিনি এখানে নেই। বাইরের বেঞ্চ থেকে আসবেন।

শিবেনবাবু বিরক্ত হয়েই বললেন, তিনি এলেও যে, সেই বেঞ্চেই আপনার কেস উঠবে তার স্থিরতা কি?

মক্কেল বললেন, স্যার হোয়ার দেয়ার ইজ আ উইল, দেয়ার ইজ আ ওয়ে: ওসব ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। এই কেসটা আমার লাইফ এ্যাণ্ড ডেথের ব্যাপার—এতে কোনো রিস্‌ক নেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

শিবেনবাবু বড় অপমানিত বোধ করলেন।

বললেন, আমাকে ফীস দিতে হবে না। এই নিন, আপনার ব্রিফ। আপনি নিজে গিয়ে অ্যাডজোর্নমেন্ট চান। আমি কী বলব গিয়ে ও'দের? কী কারণ দেখাবো?

শিবেনবাবুর মক্কেল চোখের দিকে চেয়ে বললেন, আপনি জীবনে কী কখনও মিথ্যে কথা বলেননি? আমার জন্যে না হয় একবার বললেনই। বলুন, ব্রিফ সবে পেয়েছেন, পড়তে পারেননি। আপনার একটা মিথ্যা কথা বলার উপর আমার বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

তারপরই দার্শনিকের মতো মুখ করে বললেন, যুধিষ্ঠিরও মিথ্যে বলেছিলেন। কোন্ শালা মাঝে-মধ্যে মিথ্যে না বলে?

শিবেনবাবুর ডাক পড়তেই, শিবেনবাবু ভিতরে গেলেন। ও'কে এ্যাডজোর্নমেন্ট চাইতে হলো না। ডি আর বললেন, রেকর্ডস আসেনি।

শিবেনবাবু আপত্তি করলেন না। অ্যাপীল এ্যাডজোর্নড্ হয়ে গেল।

এ্যাডজোর্নমেন্ট হয়ে যেতেই মক্কেলের মুখের কৃপাপ্রার্থী চেহারা হঠাৎ অন্য-রকম হয়ে গেল। তিনি বললেন, আপনি আর কী করলেন? আমি দরজার পাশ থেকে সব শুনেছি। কুড়িটা টাকা নিন—মিষ্টি কিনে দেবেন ছেলেমেয়েকে।

শিবেনবাবুর বড় রাগ হলো। সারা সকাল তিনি ব্রিফটাকে নতুন করে পড়েছেন। নানা কেস-ল' ঘেঁটেছেন। এখন মক্কেলের নাচানো-বাঁদর হতে হলো তাঁকে। শিবেনবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। বললেন, না পুরো ফী-ই দেবেন।

মক্কেল বললেন, নির্বিকার মুখে, আমার কাছে এর চেয়ে বেশী নেই স্যার। বলেই, একটা লালরঙা কুড়ি টাকার নোট শিবেনের হাতে দিলেন।

শিবেনবাবুর মনে হলো টাকাটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। মনে হলো, লোকটাকে

কষিয়ে এক থাপ্পড় মারেন।

কিন্তু...। টাকা...। লক্ষ্মী...।

শিবেনবাবু টাকাটা পকেটে রাখলেন। মক্কেল হাসতে-হাসতে চট্টখণ্ডী নামক অচেনা, কৃতবিদ্য ও নতুন যুগের নতুন প্রজন্মের উকিলের দিকে হেঁটে যেতে লাগলেন।

শিবেনবাবু ভাবলেন যে, তাঁরাও ব্যাকডেটেড হয়ে যাচ্ছেন।

কাউকে কিছু না বলেই শিবেনবাবু লিফটে এসে নেমে গেলেন।

কেন জানেন না, ওঁর নগেনদার কথা বড় মনে হচ্ছিল। এই নগেনদাই শিবেনবাবুকে হাওড়া কোর্ট থেকে ছাড়িয়ে প্রায় জোর করেই ট্যাক্স-প্র্যাকটিসে ঢুকিয়েছিলেন। নগেনদার জুনিয়র ছিলেন তিনি। নগেনদার বহু মক্কেল ভাগিয়ে এনে হেস্টিংস স্ট্রীটের একটা পোড়ো অডিটর-অফিসের বারান্দায় টেবল-চেয়ার নিয়ে বসেছিলেন। সে এক বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস।

সব সফল লোকের ইতিহাসই কি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস? নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু শিবেনবাবুর চোখের সামনে নগেনদার সেদিনের আশ্চর্য ব্যথিত মুখখানি প্রায়ই ভেসে ওঠে। নগেনদা বলেছিলেন, তুইও শিবেন?

'দাউ টু ব্রুটাস'-এর মতো শুনিয়েছিলো কথাটা। সে অনেক দিনের কথা।

আজ অবশ্য মনে হয় যে, ভালোই করেছিলেন সেদিন। আজ নগেনদার পসারের যা অবস্থা, তাঁর জুনিয়র হয়ে থাকলে আজকে দশা শোচনীয় হতো; তবু যতটুকু কাজ শিবেন শিখেছেন, তা নগেনদার কাছ থেকেই। সব শেখেননি। শেখার যোগ্যতাও তাঁর ছিল না; ইচ্ছাও ছিল না। শিবেনবাবু টাকা চেয়েছিলেন জীবনে আর নগেনদার লক্ষ্য ছিল অনেক উঁচুতে টাকার চেয়ে অনেক বড় কিছু যেখানে পেঁছলে টাকা অমনিই আসে। সেখানে নগেনদা পেঁছেও ছিলেন। কিন্তু এই দ্রুত বদলে-যাওয়া পৃথিবীতে নগেনদা সেখানে টিঁকে থাকতে পারলেন না। শিবেনবাবু বুঝতে পারছেন আস্তে-আস্তে নগেনদার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। নগেনদা ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতে পারেন, যাচ্ছেনও হয়তো বা, কিন্তু হেরে যাবার লোক তিনি নন। তাঁর বাবা ছিলেন এক ছোট্ট শহরের স্কুলের মাস্টার-মশাই। স্বদেশী আমলের। তাঁর জীবনে মূল্যবোধটা একটা বড় আঙ্গিক। পুরোনো মূল্যবোধ নিয়ে নগেনদা এই ভণ্ডামি, শঠতার ও আত্মমন্যতার দু নম্বর পৃথিবীতে কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছেন। লড়াই করছেন অনবরত। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর বোধ সব ছেড়ে যাচ্ছে তাঁকে, কেটে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। বুঝতে পারেন শিবেনবাবু। শিবেনবাবুর মতো ভালো নগেনবাবুকে আর কেউই বোঝেনি।

লিফট-এ নামতে নামতে শিবেনবাবু ভাবছিলেন যে, শাশ্বত মূল্যবোধ কি কখনও পুরোনো হয়? কতগুলো মূল্যবোধ কি স্থায়ী হয়েই থাকে না, থাকা কি উচিত নয় মানুষের জীবনে?

কে জানে? শিবেনবাবু এত সব ভারী ভাবনা ভাবতে অভ্যস্ত নন। ভাবতে ভয়ও করে। লজ্জাও।

রাম অবতার আজ আসেনি। এখন কোনো কাজও নেই। মক্কেলরা বিকেল তিনটে থেকে আসতে আরম্ভ করবেন চেম্বারে। আজকের মক্কেলের ব্যবহারটা তাঁকে বড় পীড়িত করেছে। লোক চিনতে পারেন না শিবেনবাবু এখনও।

শিবেনবাবুর হঠাৎ নগেনদার বাড়ি যেতে ইচ্ছে হলো খুব। সার্কুলার রোড থেকে বাঁয়ে গাড়ির মুখ ঘোরালেন ভবানীপুরের দিকে। আজ ড্রাইভার আসেনি।

অনেকদিন এ দিকটায় আসেন না। ওঁর আত্মীয়-স্বজন কাজকর্ম সবই নর্থে।

নগেনদার বাড়িতে অনেক বছর পরে এলেন শিবেনবাবু। শেষ এসেছিলেন তাঁর বড় ছেলের পৈতেতে। তাও অনেকদিন হয়ে গেল। শুনেছেন ছেলেটি পড়াশোনায় ভাল হয়নি। প্রি-ইউ পাস করেছিল বার তিনেক ফেল করে—তারপর বকাটে হয়ে যায়। পাড়ার মেয়েদের পিছনে লাগায় পুলিশ একবার ধরে নিয়ে গেছিল এ-খবরও তাঁর কানে এসেছিল।

একতলা ভাড়াবাড়িটার নোনা-ধরা, পলেস্তারাখসা দেওয়ালে একটা বিবর্ণ নেমপ্লেট ঝুলছে—নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি, এম-এ-বি-এল, এ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।

অনেকক্ষণ কড়া নাড়ার পর বৌদি এসে দরজা খুললেন। বৌদিকে চেনা যায় না। অপুষ্ট চেহারা, হলুদের ছোপ-ধরা লাল পাড় শাড়ি—ফর্সা গালে নীল শিরাগুলো ফুটে উঠেছে।

শিবেনকে দেখে অবাক হলেন। বললেন, শিবেন ঠাকুরপো? তুমি! এই অসময়ে?

শিবেন হাসল। স্বাভাবিক হবার ভান করে বলল, এই এলাম। হঠাৎ আপনাদের কথা মনে পড়ল। ট্রাইব্যুনালে এসেছিলাম। বলেই বলল, নগেনদা কোথায়? ফেরেননি?

—এত তাড়াতাড়ি তো ফেরেন না তোমার দাদা। বোসো বোসো।

লাইব্রেরী ঘরটাতে ধুলো পড়ে আছে। ছিঁড়ে যাওয়া রেক্সিনে মোড়া একটা সেক্রেটারীয়েট টেবল। ডাকে-আসা নতুন ইনকাম-ট্যাক্স রিপোর্ট টেবিলের উপর পড়ে আছে। এখনও মোড়ক খোলা হয়নি। লাইব্রেরীতে চোখ বুলোলেই বোঝা যায় যে, এখানে মক্কেলের পা পড়ে না বড় একটা।

বৌদি শিবেনবাবুকে ডেকে নিয়ে ভিতরের বারান্দায় বসালেন মোড়া পেতে। বললেন, কি খাবে বলো?

শিবেনবাবু বললেন, আপনি কি করছিলেন? খাওয়া-দাওয়া হয়নি এখনও?

কলতলায় ডাঁই-করা এঁটো বাসন পড়ে ছিল। বৌদির শাড়ির নীচটা ভেজা—শিবেনবাবু বুঝলেন যে, বৌদি বাসন মাজছিলেন।

শিবেনের চোখের দিকে তাকিয়ে নগেনদার স্ত্রী বললেন, ঠিকে-ঝিটা আজ আসেনি—আর বলো কেন? তারপর লজ্জা ও সংকোচের সঙ্গে বলল, তুমি বোসো একটু, আমি বাসন কটা মেজেই ফেলি।

শিবেনবাবু লজ্জা পেলেন খুব। নগেনদার অবস্থা এতখানি খারাপ হয়ে পড়েছে যে, তা উনি কল্পনাও করতে পারেননি। বৌদিকে দেখে ওঁর বড় কষ্ট হলো। যৌবনের বৌদির গয়না-মোড়া উজ্জ্বল হাসিখুসী চেহারাটি মনের চোখে ঝিলিক মেরে গেল।

মুখে হাসি ফুটিয়ে শিবেনবাবু বললেন, কাজ সারুন আপনি, আমি লাইব্রেরীতে বসি।

বৌদিও যেন লজ্জার হাত থেকে বাঁচলেন। বললেন, তাই বোসো ভাই। আমার খাওয়া হয়ে গেছে। এই বাসনটা মেজেই আমি আসছি।

লাইব্রেরীতে বসে, রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দিলেন শিবেনবাবু। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ও গান্ধীজীর ছবি। অন্যদিকে বৌদির হাতের কাজ। সাদা জমিতে লাল সুতো দিয়ে নক্সা করে লেখা "সত্যমেব জয়তে"। শিবেনবাবু নগেনদার চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরালেন। লাইব্রেরীর বই-

গুলোর দিকে চাইলেন। বেশীর ভাগই পুরোনো এডিশান। নিশ্চয়ই নতুন এডিশান কেনার সামর্থ্যর অভাবেই কেনেননি নগেনদা, নইলে তিনি সব বই রাখবেন না এমন হয় না। এস্টেট-ডিউটি ভাল জানেন এমন উকিল কোলকাতায় কম। তার মধ্যে নগেনদার জুড়ি হয় না। সিভিল ল'তে এত গভীর জ্ঞান এই বার-এর কম উকিলেরই আছে। নগেনদা কেন যে এস্টেট-ডিউটির উপর একটা বই লেখেন না, জানেন না শিবেনবাবু। অনেক টাকা রয়্যালটি পেতেন। কত শত উকিলকে দেখেন আজকাল দশ-পনেরো বছরে বাড়ি-গাড়ি করে ফেলছে—অথচ বলা-কওয়া বা ড্রাফটিং কাকে বলে তাই-ই জানে না। ভদ্রসমাজে মেশার মতন যোগ্যতাও নেই তাদের অনেকেরই। পয়সা রোজগার আর যোগ্যতার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য বা সাযুজ্যই বোধহয় আর নেই আজকাল।

নগেনদা এখনও বিবেকানন্দ মহাত্মা গান্ধীকে আঁকড়ে আছেন। যুগ বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, দেশের মানুষ বদলে গেছে। নিজেকে এই যুগে, এই দু নম্বরের দুনিয়ায় এ্যাডজাস্ট করতে পারলেন না নগেনদা।

কে যেন কড়া নাড়ল। শিবেনবাবু উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। দরজা খুলতেই দেখলেন নগেনদার বড় ছেলে—সানু—মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ করে দিশি মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

শিবেনবাবু একটা ধাক্কা খেলেন। মুখে বললেন, ভাল আছ সানু?

উদ্ধত, দুর্বিনীত, অশালীন ভঙ্গিমায় সানু তাকাল শিবেনবাবুর মুখে।

বলল, কেটে যাচ্ছে। তারপরই বলল, বাইরের গাড়িটা তোমার?

—হ্যাঁ। শিবেনবাবু বললেন।

তারপরেই সানু বলল, তোমার সঙ্গে বহুদিন পরে দেখা শিবুকাকা—দশটা টাকা দেবে?

—কি করবে? শিবেনবাবু শুধোলেন।

সানু শিবেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে বলল, মাল খাবো। দাও না।

শিবেনবাবু বললেন, ছিঃ সানু, তোমার লজ্জা করে না? এই ভরদুপুরে? তোমার বুড়ো বাবা খেটে মরে যাচ্ছেন, আর তুমি...

সানু ফিক্ করে হাসলো। বলল, লজ্জা? নাঃ। লজ্জা করে না। বলেই, দেওয়ালের দিকে দেখিয়ে বলল, ঐ দেখো।

শিবেনবাবু তাকিয়ে দেখলেনঃ উল্টোদিকের দেওয়ালে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে বড় বড় অক্ষরে লেখাঃ 'লজ্জা, মান, ভয়, তিন থাকতে নয়'।

সানু বলল, জ্ঞান দিও না শিবু কাকা; টাকাটা দাও। আমার দরকার।

শিবেনবাবু চটে উঠলেন। বললেন, মেহনত করে টাকা রোজগার করতে হয়—তোমাকে মদ খাওয়ার টাকা আমি দেবো না।

সানু দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলল, খুব মেহনত করো বুঝি তুমি? কত মেহনত করো? মেহনতের বুক্‌নী ঝেড়ো না। তুমিও শেষে মেহনতী মজদুরের ভেক ধরলে?

শিবেনবাবু বললেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না আমি।

সানু ঝোঁকে ছিল। বলল, আমার বাবা মিস্টার নগেন মুখার্জি, এম-এ-বি-এল এ্যাডভোকেট কি তোমার চেয়ে কম মেহনত করে? তবুও সে তোমার মতন বড়লোক হলো না কেন?

শিবেনবাবু বললেন, তুমি বরঞ্চ ভেতরে যাও। তোমার সঙ্গে সে আলোচনা

বৃথা।

—যাচ্ছি। বলেই, সানু চলে গেল।

বৌদি দৌড়ে ঘরে ঢুকেই বললেন, ঠাকুরপো কিছু মনে কোরো না। সানু এরকমই হয়ে গেছে আজকাল। পড়াশোনায় ভালো ছিল না। চাকরি-বাকরিও পেলো না। একটা হাসপাতালে ওয়ার্ডবয়ের চাকরি পেয়েছিল। তাও পাঁচশো টাকা ঘুষ দিতে হবে। তোমার দাদা কাউকে ঘুষ দেবেন না। তাছাড়া একসঙ্গে পাঁচশো টাকা বের করার ক্ষমতা তোমার দাদার নেই। তোমার দাদা একেবারে অপদার্থ। এযুগে অচল।

সানু ফিরে এসে মাকে বলল, শিবু কাকাকেই বলো না দিতে। শুধে দেবো। ধার হিসেবেই দিতো বলো। বাবার কাছে ওঁর গ্রেটফুল থাকার কথা।

বৌদি বললেন, দেবে শিবু? আমার বড় উপকার হয়, চাকরিটা একেবারে পাকা হয়ে আছে। একহাতে ডাক্তার টাকা নেবে, অন্যহাতে এ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটার সই করবে। দেবে?

শিবেনবাবু হঠাৎ বলে ফেললেন, দেবো।

বৌদি বললেন, তুমি বোসো, আমি চা করে আনি।

সানু বলল, থ্যাঙ্ক য়্যু, শিবুকাকা। তুমি প্র্যাকটিকাল লোক। তোমার হবে। তুমি আমার বাবার মতন ইডিয়ট নও। কবে যাবো বলো তোমার কাছে? বাড়িতে, না চেম্বারে?

শিবেনবাবু বললেন, পরশুর পর যে-কোনোদিন এসো। চেম্বারে।

সানু বলল, চাকরি পাওয়াটা সেলিব্রেট করতে হবে। পাঁচটা টাকা দাও শিবুকাকা—দশটা নাইই-বা দিলে।

শিবেনবাবু সানুর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে মানিব্যাগ খুলে পাঁচটা টাকা বের করে দিলেন।

সানু টাকাটা নিয়ে অনেকক্ষণ শিবেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বলল, তুমি ভগবান মাইরী। বিবেকানন্দের ছবিটা সরিয়ে এ-ঘরে তোমার ছবি বসানো উচিত। বলেই, দরজা খুলে হুট করে বেরিয়ে গেল।

শিবেনবাবু লজ্জা পেলেন, অপমানিতও বোধ করলেন। সানুর কথায় কোথায় যেন একটা তীব্র খোঁচা ছিল। কোথায় যে, তা শিবেনবাবু বুঝতে পারলেন না।

বৌদি চা আর দুটো মোয়া নিয়ে এলেন প্লেটে করে।

শিবেনবাবু চা খেতে খেতেই কড়াটা নড়ল আবার। নগেনদা ঢুকলেন, বৌদি দরজা খুলতে।

নগেনবাবু শিবেনবাবুকে দেখে অবাক ও খুশী হলেন খুব।

—কোথায় গেছিলেন নগেনদা, ট্রাইব্যুনাল থেকে বেরিয়ে? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—ক্রিমিন্যাল কোর্টে গেছিলাম।

—কেন?

—এখন সব কোর্টেই যাচ্ছি শিবু। সিভিল কোর্ট, ক্রিমিন্যাল কোর্ট—ট্যাক্স-প্র্যাকটিস তো তেমন আর হচ্ছে না। ছোট মক্কেলরা তো সকলেই ওয়ান-ফরটি থ্রি-ওয়ানে কেস করিয়ে নিচ্ছে নিজেরা। আরো অনেকে নিজেরাই হাকিমদের কাছে গিয়ে কেস, মায় আপীল পর্যন্ত করে নিচ্ছে। মক্কেলরা আগের থেকে অনেক বেশী ওয়াকিবহাল হয়েছে। দেশে শিক্ষিতর সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তো—।

ডিপার্টমেন্টও এখন পাবলিক রিলেশানের উপর জোর দিয়েছে।

শিবেনবাবু চুপ করে থাকলেন।

নগেনবাবু কোটটা খুলে রাখলেন। ঘামে কোটটা ভিজে জবজব করছে। পাখাটা চিঁড়িক্ চিঁড়িক্ করে ঘুরতে লাগল। কার্বন পুড়ে গেছে বোধ হয়। সবুজ আগুনের ঝিলিক মারতে লাগল মোটরটা থেকে।

নগেনবাবু জুতোটা খুলে টেবলের গায়ে পা দুটো ঠেকিয়ে তুলে বসে, একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে স্বগতোক্তির মত বললেন, ভাবছি প্র্যাকটিস ছেড়ে দেবো শিবেন।

—কেন? কি করবেন তাহলে? অবাক গলায় শিবেনবাবু শুধোলেন।

নগেনবাবু বললেন, আজকাল প্রফেশানে আইনের চেয়ে পাবলিক রিলেশান্স অনেক বড় হয়ে গেছে। আমাদের দিন আর নেই। যদুবাবুর বাজারে একটা ছিট কাপড়ের দোকান দেবো ভাবছি। এক পুরনো মক্কেলের ঘর আছে, পাঁঠার মাংসের দোকানের পাশে—সেলামী নেবে না আমার কাছে। ভাবছি, শীগগিরই শুরু করবো।

শিবেনবাবু লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন।

নগেনবাবু বললেন, আজকালকার এই লজ্জাকর, অপমানকর আবহাওয়ায় প্রফেশানের চেয়ে অন্য যে-কোনো বৃত্তি অনেক রেসপেকটেবল। দোকানদারীতে একটা বেসিক ইনটিগ্রিটি, সার্টেন এলিমেন্ট অফ সিনসিয়ারিটি আছে—এখানে তাও নেই। নিজের আত্মসম্মান নিয়ে আজকাল পেট চালানো শক্ত। তার চেয়ে দোকানদারী করবো—সেটা তো পাবলিক রিলেশান্স ছাড়া কিছুই নয়। কালো কোট গায়ে দিয়ে প্রতিমুহূর্তে কালো কোটের এই নিদারুণ অসম্মান আর সহ্য হয় না। এ দেশ মানুষের দেশ নেই আর। দেশ স্বাধীন হবার পর এত বাঁধ হলো, রাস্তা হলো, অ্যাটম বোমা বানানো হলো; কিন্তু মানুষ অমানুষ হয়ে গেল।

শিবেনবাবু চা-টা শেষ করে বললেন, নগেনদা, আপনি বড্ড এমোশনাল, বড় বেশী সেনসিটিভ্।

হয়ত তাই। নগেনবাবু বললেন।

তারপর ফ্যানের দিকে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তফাতটা কোথায় জানো শিবু? এই এমোশানের ব্যাপারে—সেনসিটিভিটির ব্যাপারেই। বেঁচে থাকতে হলে খেতে হয়। কিন্তু খেতে হয় বলে কী মানুষকেও জানোয়ারের পর্যায়ে নেমে, মান-অভিমান ন্যায়-অন্যায় বোধ সবকিছু খুইয়েও খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতেই হবে? রোজগার করাটাই কি জীবনের সবকিছু?

শিবেনবাবু বললেন, আপনি বড় আনপ্র্যাকটিক্যাল। বড় বেশী সেন্টিমেন্টাল। সমস্ত দেশ যেভাবে ভাবছে, যেভাবে চলছে, আপনি সেভাবেই চলুন, আপনার হাতে কতটুকু ক্ষমতা আছে? পরিবর্তন আনবেন কি করে?

—দুঃখ সেখানেই। শুধু আমার হাতেই সব ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা প্রত্যেকের হাতেই আছে। তোমার হাতেও। প্রত্যেকেই আমার মতে মত দিলে যে ছোট জগৎ নিয়ে আমরা কনসার্নড সেখানে পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকম হতো। হতে পারত। সেটা অনেক সুস্থ ও সুখের ব্যাপার হতো। কিন্তু...

শিবেনবাবু বললেন, আপনাকে লোকে পাগল বলবে; বলছে, বারের বড় বড় উকিলরা, এমনকি আপনার চেয়ে যাঁরা জুনিয়র, তাঁরাও।

—বলুক। সক্রেটিসকেও একদিন লোকে পাগল বলেছিল, গ্যালিলিওকেও।

স্পিনোজাকেও। তাতে আমার কিছু আসে যায় না। যে সমাজে টাকাই সব, যেন-তেন-প্রকারেণ আর্থিক ক্ষেত্রে সফল হওয়াটাই সব। ভাল থাকা, ভাল খাওয়া, এই-ই সব, সে সমাজের সঙ্গে আমি যুক্ত থাকতে চাই না। এরা বলে স্ট্রাগল ফর এগজিস্‌টেন্স। মিথ্যে কথা। আমি যাদের দুবেলা দেখি তারা এগজিসটেন্সের জন্যে স্ট্রাগল করে না। দে স্ট্রাগল টু আউটশাইন দেয়ার নেবারস। বার্ট্রান্ড রাসেলের কথা।

বৌদি নগেনদার চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বললেন, আমরা তো সব সময়েই শুনছি। শিবু ঠাকুরপো বহু বছর পরে এসেছে, তোমার এই বক্তৃতা কি থামাবে? যে নিজের ছেলের জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারে না তার আবার বক্তৃতা কিসের?

নগেনদা ফুঁসে উঠে বললেন, তোমার সুপুত্রের কোয়ালিফিকেশনটা কি? ওর চেয়ে হাজার গুণ কোয়ালিফায়েড ছেলেরা চাকরি না পেয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোলকাতায়। তোমার ছেলের কী যোগ্যতা আছে যে তাদের ডিঙিয়ে চাকরি পাবে? আর পাবেই বা কেন? তোমার ছেলেকে যে চাকরি দেবে সে ক্রিমিন্যাল। তোমার ছেলে না খেয়ে থাকুক, না খেয়ে মরুক। হি ডাজনট্ ডিজার্ভ আ জব্। ভদ্রলোকের ছেলে বলেই তাকে চাকরি দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তার নিজেরও যোগ্য হওয়া দরকার।

বৌদি বললেন, হ্যাঁ। যারা চাকরি পাচ্ছে সবাই যেন গুণধর। মামা, দাদা মুরুব্বী না থাকলে কেউই চাকরি পাচ্ছে না আজকাল—ঘুষ-ঘাষ না দিয়েও না।

—সরলা—! বলেই গম্ভীর গলায় ধমক দিলেন নগেনদা। মুখটা রাগে থমথম করতে লাগল।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, তোমাদের মতন মায়েরাই এই ছেলেগুলোর সর্বনাশ করলে। বাঙালী করেই রাখলে, এদের মানুষ করলে না।

বৌদি রুক্ষ কর্কশ গলায় বললেন, যে নিজের স্ত্রীকে এত অভাবের মধ্যে রাখে, যার সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, তার এত বড় বড় বুক্‌নি দেখলে লজ্জা করে। এই দ্যাখো শিবু ঠাকুরপো—তোমার জুনিয়র ছিল একদিন, তার আজ কত রব্‌রবা। লোকের গুণ স্বীকার করার মহত্ত্ব নেই—খালি নিজের গুণ গাওয়া। যে গুণে পয়সা আসে না তেমন গুণের মুখে আগুন। তুমি এক্কেবারে চুপ করে থাকো।

নগেনদা তারপর আর কোনো কথা বললেন না। দেওয়ালের বুকের উপর আড়াআড়ি করে দু'হাত রাখা বিবেকানন্দের ছবির দিকে চাইলেন একবার। তারপর 'সত্যমেব জয়তে'র দিকে। পরক্ষণেই মাথা নামিয়ে নিলেন।

সেদিন শিবেনবাবু আরও আধঘন্টা বসেছিলেন, কিন্তু নগেনবাবু তাঁর সঙ্গে কিংবা অন্য কারও সঙ্গে আর একটিও কথা বলেননি।

নগেনদার বাড়ি থেকে বেরিয়েই শিবেনবাবু লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর গাড়ির ওয়াইপার দুটো নেই। শুধু রবারের ব্লেডই নয়—স্টীলের হাত দুটোও গায়েব। কেন যেন শিবেনবাবুর মনে হলো এ সানুর কাজ।

চেম্বার ছেড়ে উঠতে যাবেন, এমন সময় ফোনটা বাজল।
—হ্যালো!
—ব্যানার্জি?
—হ্যাঁ! কে বলছেন?
—আমি গদাই।
—বল গদাই।
—এক্ষুনি একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে।
—কোথায়?
—জমির মালিকের কাছে।
—কেন? কোথাকার জমি? তোমার তো দেখছি ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে কান্ড।
—দুটো জমির খোঁজ আছে নিউ আলিপুরে আর টালিগঞ্জে গলফ ক্লাবের কাছে। একজনই মালিক। কথা কইয়ে দেবো। আমার কিন্তু দু পার্সেন্ট। টোটাল ডিলের উপর।
শিবেনবাবু ভেবে নিলেন, আজ কি কাজ ছিল। তারপর বললেন, ঠিক আছে তুমি চলে এসো। দেরী কোরো না।
—না। আমি কাছ থেকেই বলছি। দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।
শিবেনবাবু মাধবীলতাকে ফোন করলেন।
বললেন, মহারাণীর জন্যে এখন যেতে হচ্ছে আমায় অনেক জায়গায়। তুমি কি যাবে নাকি? জমি দেখতে?
—নাঃ। মাধবী বললেন।
—চলো না। তোমার পছন্দ না হলে তো হবে না। আমি আর কদিন আছি। পঞ্চাশ ত হলো। কোনদিন সেরিব্র্যাল কি করোনারি।
—বাজে কথা রাখো। মাধবী বললেন, তাছাড়া রাতের বেলা কি কেউ জমি দেখে?
শিবেনবাবু বললেন, ঠিক আছে। কথা বলে আসি, তারপর দিনের বেলা দেখাবো তোমাকে। গদাই ব্যাটার যত গদাই-লস্করী কারবার। কবে থেকে বলছি তা এত-দিনে তার সময় হলো। আর এক্ষুনি নাকি যেতে হবে।
—ঠিক আছে। ফিরবে কখন?
—কি করে বলব? ফিরতে বোধহয় রাত হবে। নটা-সাড়ে নটা।
মাধবী বললেন, তোমার জন্যে হিং-এর কচুরি আর দই-বড়া বানিয়েছিলাম। ঠিক আছে রাতে খাওয়ার সময় খেও।
শিবেনবাবু বললেন, হঠাৎ কচুরি? কেউ আসবে নাকি আজ?
—আহা! তোমার জন্যে যেন কিছু করা হয় না কোনোদিন।
—তা হয়। অনেক কিছুই করা হয়। কিন্তু কেউ কি আসছে, মানে এসেছে?
—কে আবার আসবে? সুনীলদা এসেছে।
—অঃ। শিবেনবাবু বললেন।
—ছেড়ে দিচ্ছি। বলে মাধবী ফোন ছেড়ে দিলেন।

এই সুনীলদা লোকটি শিবেনবাবুকে বেশ পীড়া দিচ্ছে। গানের মাস্টার। বাড়িতে প্রথম ঢুকেছিল আট বছরের মেয়ে পিয়াকে গান শেখাতে। পিয়ার মা-ও এখন ছাত্রী। আজকাল যে সময় সুনীল আসে তখন পিয়া পড়তে বসে। ঠাকুর রান্নাঘরে। মিনু টি-ভির সামনে আঠা হয়ে বসে থাকে। আর মাধবীর নাকি শোওয়ার ঘরের খাটের উপর না বসে গান শেখাই হয় না। শিবেনবাবু লক্ষ্য করেছেন সুনীল হঠাৎ-হঠাৎ আসে। মাধবী জানে কিনা জানে না, অন্তত তিনি ওর আগমনের দিন সময় কখনই জানেন না। বেশীর ভাগ দিনই এমন সময় আসে যখন শিবেন-বাবু বাড়ি থাকেন না। সুনীল যেদিন আসে সেদিন বিশেষ কিছু রান্না হয়, শোবার ঘরে ধূপকাঠি জ্বলে, গরমে বেলফুল, শীতে রজনীগন্ধা আসে। শোবার ঘরটা কেমন মন্দির-মন্দির গন্ধে ভরে ওঠে কিন্তু শিবেনবাবু বুঝতে পারেন যে, এ মন্দিরের পুজোর দেবতা তিনি নন। আজকাল প্রায়ই শিবেনবাবুর বড় রাগ হয় তাঁর জ্যাঠামশায়ের উপর। বয়সের ডিফারেন্স থাকা ভাল বলে পনেরো বছরের ছোট মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না জ্যাঠামশাই-এর। জ্যাঠামশাই-এর এই জ্যাঠামির জন্যে তাঁকে ইদানীং বড়ই চিন্তিত থাকতে হয়। পঁয়তাল্লিশ বছর অবধি তিরিশ বছরের যুবতী স্ত্রীকে একটি জবরদস্ত এ্যাসেট বলেই তিনি জেনে এসেছেন। নিজে পঞ্চাশ পেরিয়ে এসে এবং অত্যধিক পরিশ্রমে শরীর খারাপ করে ফেলায় এখন মাধবীকে এ্যাসেট নয়, মাঝে মাঝে লায়বিলিটী বলেই মনে হয়, দেরী করে বিয়ে করায় এবং বিয়ের প্রায় আট বছর বাদে প্রথম সন্তান হওয়ায় ছেলে-মেয়ে তেমন বড় হয়নি। এতদিনে তারা বড় হয়ে গেলে, মেয়ে শাড়ি পরতে শুরু করলে মাধবীরও নিজেকে আর অত তরুণী বলে মনে করার অবকাশ থাকত না।

তাছাড়া জীবনের মধ্যভাগে এসে ও'র অবস্থা ফেরায় মাধবীর সমস্ত শখ-আহ্লাদ যেন অবেলায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শিবেনবাবু নিজের জীবনেই দেখছেন যে মানুষের অবস্থা যখন ফেরে তখন প্রথম দশ বছর মানুষ শুধু ভালো খায়-পরে। সাচ্ছল্যের স্বাদটা খাওয়া-পরার মধ্যেই প্রচন্ডভাবে স্তব্ধ থাকে। তারপরই অন্যান্য দিকে চোখ পড়তে থাকে। একটা একটা করে প্রয়োজন বাড়ে মানুষের। যার অভাব কখনও অসাচ্ছল্যের দিনে মনে জাগেনি সেইসব জিনিসের জন্যেও মনে তীব্র অভাববোধ জাগে এক এক করে। মাঝে মাঝে অবচেতন মুহূর্তে শিবেন-বাবুর একথা মনে হয় যে, সাচ্ছল্যই মানুষের সর্বনাশ করে মানুষকে অমানুষ করে তোলে।

জানেন না, হয়তো তিনি ভুল করলেন, হয়তো পুরো ব্যাপারটাই তাঁর নিছক সন্দেহ। মনে হয়, সুনীলের গান শুনতেই ভালোবাসেন মাধবী। সুনীল মাস্টার হয়তো মাধবীর দু নম্বর নয়।

শিবেনবাবু নিজেকে এক ধমক লাগালেন। বললেন, ডোন্ট বী মীন, সিলী ওল্ড ফুল।

গদাই এসে পড়তেই বেরিয়ে পড়লেন শিবেনবাবু। রাম অবতারটার অসুখ হয়েছে, ভারী অসুখই হবে। চার পাঁচদিন হ'য়ে গেল। পনেরো বছর রাম অবতার কাজ করছে তাঁর কাছে, কিন্তু রাম অবতার কোথায় থাকে তা তাঁর জানা নেই। রাজাবাজারের দিকে এক বস্তীতে থাকে। ঠিকানাটা আছে। একবার খোঁজ করতে হয়। চিকিৎসার জন্যে কিছু টাকাও দেওয়া দরকার। বহুদিনের পুরনো লোক। আজ যাব, কাল যাব বলে পনেরো বছর হয়ে গেছে। রাম অবতারের ডেরায় যাওয়া

হয়নি।

লিণ্ডসে স্ট্রীটে গাড়ি ঘুরিয়ে নিউ মার্কেটে দাঁড় করালেন শিবেনবাবু। অনেকগুলো টাকা পেয়েছেন আজ অযাচিতভাবে। মাধবীর জন্যে কটা লিপস্টিক ও একটি পারফ্যুম কিনবেন ঠিক করলেন। এই সুনীল মাস্টারের জন্যে কিছুদিন মাধবীকে একটু গুড হিউমারে রাখা দরকার।

নিউ মার্কেটে নিজে বিশেষ আসেন-টাসেন না উনি। ফর্সা-ফর্সা সিন্ধী দোকানদারগুলোর ব্যবহার খুব ভালো। ওদের দোকানে না-ঢুকে উপায় থাকে না। এক দোকানে ঢুকলেন, লিপস্টিক নেই কিন্তু ইন্টিমেট পারফ্যুমের বড় শিশি পাওয়া গেল—বডি ডিওডোরান্ট, হেয়ার-স্প্রে। সব নিলেন। প্রায় আড়াইশো টাকা মতন গচ্চা গেল। এই সব সুগন্ধই হয়তো সুনীলের ঘ্রাণেরই জন্যে।

—নাঃ। উনি বকলেন নিজেকে। ইনকরিজিবল্ হয়ে উঠছেন দিনে দিনে।

দোকান থেকে বেরোতে যাবেন এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল কাঁচের র‍্যাকে। অনেক হাল্কা প্যাস্টেল-রঙা রঙের জিনিস। দাঁড়িয়ে পড়ে শিবেনবাবু শুধোলেন, ওগুলো কি?

—ইমপোর্টেড নাইলন প্যান্টি। দোকানী বলল, দাদু নিন না মেয়েদের জন্যে। বলেই তাক থেকে এক গাদা নাইলন প্যান্টি নামালো দোকানদার। আবার বলল, ফ্রী সাইজ। নিন, আপনার মেয়েদের জন্যে পছন্দ করে নিন দাদু।

শিবেনবাবু মনে মনে বললেন, শাটআপ। গর্দভ।

বলেই, দোকানের আয়নায় নিজের কালো কোট পরা চেহারাটা একটু দেখলেন। ঘামে জবজব করছে মুখ, টাইটা নেতিয়ে গেছে, চুলগুলো শুধু সাদাই যে হয়েছে তাই-ই নয়, সব উঠে গেছে। মুখের রেখাগুলো চম্বলের বেহড়ের মতো খাদের সৃষ্টি করেছে—তাতে আলো-ছায়ার খেলা। কপালে বলিরেখা। নাঃ, কখন যে, জজ সাহেবদের আর ট্রাইব্যুনালের মেম্বারদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আই-টি-আর আর এ-আই-আর-এর সাইটেশন মুখস্থ করে করে, পেপার বুকে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে দিতে এতগুলো বছর হারিয়ে ফেলেছেন, তা তাঁর নিজেরই হুঁশ নেই। অনেক কিছু পেয়েছেন যেমন, অনেক কিছু হারিয়েও বসে আছেন। এভরি ডেবিট হ্যাজ আ ক্রেডিট। অ্যাকাউন্টটেন্টরা বলেন। শুনেছেন তিনি। এমন সত্য আর নেই।

একটি হাল্কা নীল ও একটি হাল্কা হলুদ প্যান্টি কিনলেন শিবেনবাবু। কোনোদিনও মাধবী এসব পরেননি। আজকে প্রৌঢ় বয়সে কিনে নিয়ে গেলে কি বলবেন যে তিনি, তা জানেন না শিবেনবাবু। তিনি প্রৌঢ় হতে পারেন, তা বলে মাধবী তো নয়। শিবেনবাবুর বড় সাধ হলো এক রাতে আয়নার সামনে চুলখোলা সুন্দরী, তন্বী, মাধবীকে দাঁড় করিয়ে নিজে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে মাধবীকে প্যান্টীতে দেখবেন। ভাবতেই রোমাঞ্চে তাঁর গা শিরশির করে উঠলো।

তিনি কি পারভার্স হয়ে যাচ্ছেন? ভাবলেন শিবেনবাবু।

পরক্ষণেই শিবেনবাবুর মনে হলো উকিলদের কাছে "পারভার্স" কথাটার মানে সম্পূর্ণ অন্য। যখন কোনো অর্ডারের পারভার্সিটি সম্বন্ধে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করে মিসেলেনিয়াস অ্যাপ্লিকেশান, অথবা রেফারেন্স অ্যাপ্লিকেশান আর্গু করেন তিনি, তখন তো এমন গা শিরশির করে না। আসলে এই নরম কোমল প্যান্টি দুটিই গা শির-শিরানির কারণ—পারভার্সিটি নয়।

গদাই বলল, কি কিনলে?

শিবেনবাবু বললেন, বয়স তো হলো, গাঁটে গাঁটে গেঁটে বাত। নী-ক্যাপ, এ্যাংক্লেট এইসব কিনলাম, আর টাকে লাগানোর তেল।

গদাই বলল, গরীবের একটা কথা শুনবে?

—কি?

—দুবেলা ভাতের সঙ্গে ঘি দিয়ে ভেজে দু কোয়া করে রসুন খাও। সঙ্গে এ-বেলা ও-বেলা একটা করে আস্ত কাঁচা পেঁয়াজ। দুটো করে কাঁচা লঙ্কা। বাতের বাপের নাম খগেন হয়ে যাবে। গায়ে অসুরের বল আসবে। সব রকমের বল।

বলেই, গদাই একবার তাকালো শিবেনবাবুর দিকে।

শিবেনবাবু মনে মনে একটু রাগলেন, মুখে কিছু বললেন না। ছোটবেলায় হেদোতে একসঙ্গে সাঁতার কাটতেন দুজনে।

গদাই নিউ আলিপুরের জি ব্লকের জমিটায় পরে নিয়ে গেল, আগে টালীগঞ্জের গল্‌ফ ক্লাব রোডের জমিটা দেখিয়ে। দুটো মালিকই এক লোক। নিউ আলিপুরের জমিটা ভালো। কর্নার প্লট। কাছাকাছিই অনেক অ্যাকটর-অ্যাকট্রেসদের বাড়ি। সমস্ত পাড়া ফিটফাট—দারুণ দারুণ ফিগারের ও সাজের মেয়েরা ও কেতাদুরস্ত ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বারান্দায় বসে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা স্বামীর সঙ্গে বসে চা খাচ্ছেন সুবেশা মহিলারা।

শিবেনবাবু মনে মনে বললেন, এ পাড়ায় আর কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু মরে গেলেও তিনি লুঙ্গি ছাড়তে পারবেন না। এ-পাড়ায় লুঙ্গি পরে বারান্দায় বসলে কি পথে বেরোলে পাড়ার ছোঁড়ারা কি ঢিল মারবে? এই জঘন্য অপরাধের জন্যে কি মেয়ের বিয়ে হবে না শিবেনবাবুর? তারপর ভাবলেন, এসব কথা গদাইকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই কোনো।

জমি দেখে বেহালায় যাওয়া হলো। যাঁর জমি তিনি আহ্নিক করছিলেন চান করে। অনেকক্ষণ বসতে হলো বসবার ঘরে। দেওয়ালে নানা চেহারার এবং নানা পোশাকের সব সাধু-সন্তদের ছবি। ভুঁড়িহীন, গেরুয়া-বসন, বল্কল-আসন।

গৃহস্বামী এলেন। বয়স শিবেনবাবুর মতোই প্রায়। এসে বসে বললেন, বলুন।

শিবেনবাবু বললেন, একটু জল পেতে পারি?

—নিশ্চয়ই।

চাকর জল নিয়ে এলো।

জল খাওয়া হলে, শিবেনবাবু বললেন, আমার নিউ আলিপুরের জমিটাই পছন্দ।

ভদ্রলোক বললেন, উত্তম কথা।

তারপর গদাই-এর দিকে চেয়ে বললেন, গদাইবাবু দাম বলেছেন?

—না স্যার।

—না কেন? আমি কি বেগুন বেচছি যে দাম-দর করব প্রতি গ্রাহকের সঙ্গে?

বলেই বললেন, কুড়ি করে কাঠা! চার কাঠা পাঁচ ছটাক আছে। দশ এক নম্বরে দশ দু নম্বরে। প্রতি কাঠার হিসেবে।

—আজ্ঞে? শিবেনবাবু বুঝেও না বোঝার ভান করলেন।

ভদ্রলোক বললেন, ক'দিন আগে হলে তো পাঁচ এক নম্বরে আর পনেরো দু নম্বরে নিতাম। কর্তা কি জানেন যে, ইনকামট্যাক্সের আইনে অ্যাকুইজিশান বলে

একটা আইন আছে। তাছাড়া, তাঁদের ভ্যালুয়েশান সেলের তো মাথামুণ্ডু নেই। গাঁজা খান না হাসিস্ খান জানি না তেনারা। এখানের জমি নাকি পঁয়ত্রিশ হাজারে বিক্রী হচ্ছে আকছার তাঁদের মতে। গত দেড়বছর এক নম্বর দু নম্বর মিলিয়ে পনেরো, স্যরি, কুড়ি করেই পাচ্ছি না কাঠা—আর পঁয়ত্রিশ!

শিবেনবাবু আবার বললেন, দাম কি সত্যিই কুড়ি?

ভদ্রলোক বললেন, ইয়েস্।

তারপর গদাইকে দেখিয়ে, চোখ টিপলেন।

শিবেনবাবু বললেন, আজ্ঞে আমার যে অত দু নম্বর নেই।

—নেই তো হবে না।

ভদ্রলোক এক চোখ বন্ধ করে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বললেন।

শিবেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

তারপর বললেন, আমি যদি পুরোটাই চেকে দিই!

—চেক-এ পুরো নিতে পারবো না। তবে আপনি দশ অ্যাকাউন্টপেয়ী চেক দিয়ে বাকিটা সেলফ বেয়ারার চেক-এ তুলে আমায় দিতে পারেন। আমার উপায় নেই।

শিবেনবাবু ওঁকে বোঝাবার জন্যে বললেন, এতেও তো ইনকামট্যাক্স থেকে নোটিশ পেতে পারেন।

—পারি, কিন্তু তাতে আমার কি? নিলে আপনার জমি নিয়ে নেবে? আমি তো টাকা পেয়ে কোম্পানি ডিফাঙ্কট্ করিয়ে দেবো। আমার ওরা করবে ঘন্টা। বজ্র-আঁটুনী ফস্কা-গেরো। সব আইনেরই ফাঁক থাকে। গত তিনপুরুষ এই করে খাচ্ছি। আইন যারা মানে তাদের জন্যে, আমার জন্যে নয়। তবে রিস্কটাকে মিনিমাইজ করে রাখা ভাল।

শিবেনবাবু বললেন, জমিটা সত্যিই পছন্দ হয়েছিল। আমি জমি কিনে তার উপর বাড়ি আরম্ভ করে অ্যাকুইজিশানের ঝামেলায় পড়তে চাই না। সাহস হয় না। চেক-এ যদি নিতেন, তাহলে ভালো হতো বড়।

—ধ্যাৎ মশাই। বলে, ভদ্রলোক বড় অভদ্রের মতো মুখবিকৃতি করলেন।

তারপর বললেন, আমার সময় নষ্ট করবেন না। এ-দুনিয়ায় ভীরু লোকদের কোনো জায়গা নেই। যার সাহস আছে, দু নম্বর আছে, সেই-ই আমার জমি নেবে—তাকেই বিক্রী করব। তাছাড়া আমি কি ইচ্ছা করে করছি? যখন কিনেছিলাম, তখন কি আমি পুরো চেক দিয়ে কিনেছিলাম না কি আমি চাইলেই তা পেতাম? রাতারাতি এরা আজকে এর জমি তার বাড়ি নিয়ে টান মারছে—এতদিন কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছিল সকলে? মিনিস্টারেরা কি দু নম্বর বানায়নি? ইলেকশানের খরচ কি সব এক নম্বরে চলছে এতদিন, না ভবিষ্যতেও চলবে?

তারপর হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, যান যান মশাই! আমাকে বকাবেন না। আমার হাইপারটেন্শান আছে।

শিবেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ভদ্রলোক একটু অনুশোচনার গলায় বললেন, আমি আপনি কি করতে পারি? দু নম্বরে তেলাপোকার ডিম ফোটার বাচ্চার মতো ছেয়ে গেছে দেশ। ব্যবসা করবেন? মাল কিনতে যান দু নম্বর, বেচতে যান দু নম্বর হয়ে যাবে একটা অংশ। প্রফেশান করুন—আপনি চান আর নাই-ই চান দু নম্বর নিতে হবে। প্রতি মুহূর্তে এদেশে মানুষের বাচ্চার মতো দু নম্বর পয়দা হয়েছে হচ্ছে, জিওমেট্রিকাল

প্রোগ্রেশনে বেড়েছে বছর বছর। আগে যেমন ফ্যামিলি প্ল্যানিং হয়নি, তেমন হয়নি দু নম্বর প্ল্যানিং। আজকে আমার জমি, আপনার বাড়ি কেড়ে নিয়ে নিজে-দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে এরা! সব মিনিস্টারের, এম. পি-দের সমস্ত সম্পত্তি এইরকম ভ্যালুয়েশান সেলে পাঠিয়ে জবরদস্তি ভ্যালুয়েশান করে আগে নিয়ে নিত তো বুঝতাম। তারপরে আমাদের কাছে এসো। তবে বুঝব, ডেমোক্রেসীর বুক্‌নী। তাঁরা ত বক্তিমে দিয়েই খালাস আর আমরা সব গলা জলে।

শিবেনবাবু ও'র কথার তোড় থামিয়ে দিয়ে বললেন, চলি।

ভদ্রলোক বোধহয় শুনলেন না। সমান তোড়ে বলে চললেন, হুঃ। যত দোষ নন্দ ঘোষের। ধোয়া-তুলসীপাতা। কোয়ার্টার সেঞ্চুরি ধরে তিন পুরুষে দু নম্বর বানিয়ে এখন শিরিস কাগজ মারতে লেগেছো জং-এর ওপর। আমাদের মতো চুনোপুঁটির নাকের ছাল তুলছো। ডেমোক্র্যাসী না ছাই!

গদাই বলল, কেমন বুঝলে?

শিবেনবাবু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। বললেন, কি আর বুঝব? ও'র দোষ কি? আমারই পোষাল না। যার দু নম্বর নেই তার কিছুই নেই আজ। অর্থ, প্রতিপত্তি সম্পত্তি।

মাঝেরহাট ব্রিজটা সবে পেরিয়েছেন এমন সময় কট-কটাং করে একটা আওয়াজ করে গাড়িটা থেমে গেল। কোনোক্রমে বাঁয়ে সাইড করিয়ে গাড়ি রাখলেন শিবেন-বাবু। গদাইকে বললেন, গাড়ির কিছু বোঝো?

গদাই হাসল। বলল, বাঁড়ুজ্যে, বাড়ি বুঝি আর নারী বুঝি, ঘোড়াও বুঝি ভালোই, কিন্তু গাড়ি বুঝি না। কিন্তু তুমি বোসো। চেতলায় এসে পড়েছি। এক্ষুনি মিস্ত্রী ধরে আনছি।

শিবেনবাবু গাড়ি থেকে নেমে, মাডগার্ডে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগা-রেট ধরালেন।

কতগুলো ছেলে মোড়ের মাথায় একটা বাড়ির রকে বসেছিল। কথাবার্তা বলছিল। একটা বাস আলিপুরের দিক থেকে এসে দাঁড়াল। কয়েকজন যাত্রী নাম-লেন। সকলেই প্রায় চেতলার দিকে চলে গেলেন। একটি অল্পবয়সী মোটামুটি সুন্দরী মেয়ে, হাতে কালো ব্যাগ নিয়ে এদিকে এলো রাস্তা পেরিয়ে, তারপর প্রায়ান্ধকার গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

ছেলেগুলোর মধ্যে একটা ছেলে বললো, কোথায় যায় বল্ তো হপ্তায় তিন-চারদিন। রোজই দেখি রাত করে ফেরে।

অন্য ছেলেটি বলল, আস্তে বল্, রমেশের মেজদি ও। নাম ময়না।

আর একটি ছেলে জোরে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটাকে শূন্যে ছুঁড়ে বলল, ময়না, ময়না, আর সয়না!

প্রথম ছেলেটি বলল, তুই তো চিনিস। তবে তুই-ই বল।

—কোথায় আবার যায়? চাকরি করতে যায়।

—কী চাকরি রে? সপ্তাহে তিন-চারদিন, মাঝে মাঝে একসঙ্গে পাঁচ-ছদিন কামাই। রাত করে ফেরা?

দ্বিতীয় জন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, মারব এক লাথি শালা। সবই তো জানিস, তবু নোংরামি না করলে ভালো লাগে না, না? কিছু তো করবে?

না খেয়ে থাকার চেয়ে তো ভালো?

—যাঃ শালা! এ যে দেখি ধম্মপুত্তুর! খুব যে পীরিত!

—পীরিত থাকলেই বা কি? মুরোদ কি আমার? আমার মুরোদ থাকলে ময়না যা করছে তা করতে দিতাম? ওকে পাটরানী করে রাখতাম।

একটা ছেলে বলল, করবে কি? অতগুলো ভাই-বোন। উপায় কি?

প্রথম ছেলেটি সখেদে বলল, ভগবান বড্ড মেয়েদের দিকে। বল্? ওরা বেশ আছে। মজা-কে মজা লুটছে, পয়সা-কে পয়সা।

তৃতীয় ছেলেটি বলল, হ্যাঁ। বাজারে দেদার দু নম্বর পয়সা। সারা ভারত-বর্ষের লোক মাইরী আমাদের মেয়েগুলোকে নিয়ে এই কলকাতায় কী দু' নম্বর প্রেমই করছে! আর আমরা? আঙুল চুষছি।

অন্যজন বলল, ওসব ছাড়। আকাশকুসুম। একটা চাকরীই পাচ্ছি না।

গদাই সঙ্গে একজন মিস্ত্রীকে নিয়ে এলো!

মিস্ত্রী নীচু হয়ে বসে একমুহূর্ত দেখেই বলল, ওঃ, এ তো এ্যাকসেল্ গেছে!

এ্যাকসেল? শিবেনবাবু চমকে উঠলেন!

বললেন, মাস দু-তিন আগেই তো আমার ড্রাইভার এ্যাকসেল্ বদলালো। পরিষ্কার মনে আছে।

মিস্ত্রী বলল. হবে। কিন্তু নিশ্চয়ই দু নম্বর মাল।

—মানে?

—মানে জাল।

—এ্যাকসেল জাল মানে?

—আপনি বাবু কোন্ দেশের লোক? মোটরগাড়ির সমস্ত পার্টসই এক নম্বর দু নম্বর হয় জানেন না? পাঞ্জাবে, হরিয়ানায় দু নম্বর পার্টসের কারখানায় ছেয়ে গেল। আমরা তো সব বাবুদেরই শুধিয়ে নিই, তারপরেই লাগাই এক নম্বর কি দু নম্বর! যা বলেন। আমাদের দু নম্বর কারবার নেই, মজুরী একটু বেশী নিই; কিন্তু সাফ্ সাফ্।

শিবেনবাবু বললেন, যাই-ই হোক, যা করবার তাড়াতাড়ি করো বাবা।

—এক নম্বর লাগাবো তো? মিস্ত্রী শুধোল।

—তফাৎ কি? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—তফাৎ এই যে, এক নম্বর কিছুদিন বেশী টিকবে। কিন্তু দাম প্রায় ডবল।

—তবে দু নম্বরই লাগাও।

—ঠিক আছে। বলে মিস্ত্রী চলে গেল।

শিবেনবাবু বললেন, বড় পিপাসা পেয়েছে, চলো একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক খাই গদাই!

দুজনে পানের দোকানটার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

গদাই বলল, দুটো ঠাণ্ডা দাও।

—কি দেবো? দোকানী বলল।

—কি দেবে? গদাই শুধোল।

শিবেনবাবু বিরক্তির গলায় বললেন, যা হয় দাও।

—যা হয় দাও। গদাই রিপিট করল।

দোকানী ট্রানজিস্টারে বিবিধ ভারতী শুনতে শুনতে দুটো কালো বোতল

তুললো বরফের বাক্স থেকে, এমন সময় গলির মধ্যে থেকে দুজন ভদ্রলোক দৌড়ে এলেন দোকানে ওইরকম কালো একটা বোতল হাতে নিয়ে!

হৈ-হৈ পড়ে গেল। রকের ছেলেগুলোও দৌড়ে এলো। ব্যাপারটা জানা গেল এই যে, একটু আগে এই দোকানের কালো বোতলের পানীয় খেয়ে এক ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

শিবেনবাবুদের জন্যে সদ্য-খোলা একটা বোতল থেকে একটু পানীয় মুখে ঢেলেই রকের একটি ছেলে চটাস করে চাঁটি কষালো দোকানীর মাথায়।

বলল, হারামী! কোকাকোলা, লিমকা, ফানটা এসবও দু নম্বর? কোথা থেকে আনছ শালা? কোম্পানীর মাল?

দোকানী কাঁদতে কাঁদতে বলল, কোম্পানীর মাল এখানে দেয় না—এতটুকু দোকানে—আমরা ক্রেটে করে তুলে আনি বড় দোকান থেকে।

—কোন্ দোকান থেকে? বল্ শালা? চল্ দোকানে।

যে ভদ্রলোকেরা দৌড়ে এসেছিলেন, তাঁরা বললেন, এখন না, দাঁড়ান। পাশের বাড়ি থেকে এনফোর্সমেন্টে ফোন করে দেওয়া হয়েছে। ও'রা এসে যাবেন। এনফোর্সমেন্ট থেকে আমাদের বললেন ও'রা যে, প্রায় সব চালু পানীয়গুলোই এই গরমের সময় ভীষণ জাল হচ্ছে।

দোকানের সামনে ভীড় জমে গেল। শিবেনবাবুর জল খাওয়া হলো না। ফিরে আসার সময় বস্তীর সামনে একটা টিউবওয়েল দেখতে পেলেন। গদাই টিপল, উনি খেলেন। উনি টিপলেন, গদাই খেলো।

ছেলেদের মধ্যে দুজন এসে বলল, এই যে দাদা, অসুস্থ ভদ্রমহিলাকে একটু হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যান।

শিবেনবাবু রুমালে হাত মুছতে মুছতে বললেন, নিশ্চয়ই দিতাম। কিন্তু এ্যাকসেল কেটে গেছে যে। যতক্ষণ না বদলানো হচ্ছে...।

ভদ্রমহিলার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছিল। একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক ও একটি অল্পবয়সী ছেলে তাঁকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এলো। ছেলেরা একটা ট্যাক্সি ধরলো। বাদবাকিরা এনফোর্সমেন্টের গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

প্রথম ছেলেটি বলল, সরযূর কাছ থেকে বড় দোকানের হদিস নিয়ে চল আমরা যাই। নইলে শালা, পুলিশকে পয়সা-ফয়সা খাইয়ে ফিট করে রেখে দেবে, গিয়ে লাভ হবে না পরে।

—যা বলেছিস।

দ্বিতীয় জন বলল, এ-দেশের ওষুধ ছিল একটাই। নক্‌শাল।

প্রথম ছেলেটি বলল, চুপ কর। কে শুনে ফেলবে।

—শুনুক। দ্বিতীয় ছেলেটি বলল।

—তবে শুনুক। বলে, প্রথম ছেলেটি সন্দেহের চোখে চাইল শিবেনবাবুর দিকে।

মিস্ত্রী এসে কাজ করতে করতে আরো পনেরো-কুড়ি মিনিট চলে গেল।

এমন সময় একটা ট্যাক্সি দ্রুতবেগে ছুটে এলো চেতলার দিক থেকে। যে বাচ্চা ছেলেটি ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গেছিল হাসপাতালে—সে একা ফিরে এলো ট্যাক্সিতে।

উদ্ভ্রান্তের মতো কাঁদতে কাঁদতে দরজা খুলে নেমেই ছেলেটি বলল, মা মরে গেল। ও বিকাশ দা! আমার মা মরে গেল এক্ষুনি। বাচ্চা ছেলেটি কাঁদতে

কাঁদতে বলল, ইনজেকশানে ভেজাল ছিল। বাবা প্রেসক্রিপশান পেয়ে দৌড়ে ইনজেকশান কিনে আনল—ইনজেকশান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই...।

একটা ছেলে দৌড়ে গিয়ে এক ঘুষিতে পানওয়ালা ছোকরাটিকে তার উচ্চাসন থেকে ফেলে দিলো নীচে। আর একজন পা তুলে দিলো তার মাথায়।

গলির মধ্যে থেকে পিলপিল করে লোক বেরিয়ে আসতে লাগল। ছেলেটিকে বোঝাতে বোঝাতে অনেকে তাকে নিয়ে আবার ট্যাক্সিতে উঠে বসল। পরক্ষণেই ট্যাক্সি হাসপাতালের দিকে চলে গেল। এদিকে-ওদিকে আত্মীয়স্বজনদের খবর দিতে বেরিয়ে পড়ল অনেকে।

ছেলেদের মধ্যেই একজন পানের দোকানের ছেলেটাকে তুলে এনে টিউবওয়েলের নীচে বসিয়ে তার মাথায় নাকে জল দিতে লাগল। নাকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ছেলে দুটো একই বয়সী হবে। নাক-ফাটা ছেলেটার একটা জীবিকা আছে, নাক-ফাটানো ছেলেটার নেই। তফাৎ এইটুকুই।

সেই নতুন মক্কেল সময়মতোই এসেছিলেন।

শিবেনবাবু মনোযোগ দিয়ে সিজার লিস্টগুলো দেখলেন। বেশীর ভাগ গয়না পাওয়া গেছে ওঁরই শোবার ঘর থেকে। খাতাপত্রও দশ বছরের এক নম্বর ও দু নম্বর নিয়ে গেছেন ডিরেকটরেট অফ ইনসপেকশানের অফিসারেরা। অডিটেড ব্যালান্স শীট দেখলেন শিবেনবাবু গত পাঁচ বছরের—এ্যাসেসমেন্ট অর্ডারও। কোনো বছরই পঁচিশ থেকে তিরিশ হাজারের বেশী মুনাফা দেখানো হয়নি।

শিবেনবাবু শুধোলেন যে, দু নম্বরের খাতা যে ধরে নিয়ে গেছেন ওঁরা, তাতে মুনাফা কত আছে ?

—ফী বছরের মুনাফা তো কষিনি স্যার। কাকার আমল থেকে যা কিছু কামিয়েছি হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে, তার মোটামুটি হিসেব আছে সিন্দুক খাতায়।

শিবেনবা বললেন, সিন্দুক খাতা তো আর এখন আপনি আমাকে দেখাতে পারছেন না। খাতার ইনসপেকশান চাইব—। খাতা থেকে নকল তুলুন তখন বোঝা যাবে বছর বছর কত আসল মুনাফা।

ভদ্রলোক রামভক্ত হনুমানের মতো হাতজোড় করেই বসেছিলেন সামনে। বললেন, আজ্ঞে।

শিবেনবাবুর মনে হলো, বড় বেশী বিনয়ী ভদ্রলোক।

শিবেনবাবু শুধোলেন, মুনাফা তো আপনিই করেছেন, মোটামুটি আন্দাজ তো একটা দিতে পারেন ?

ভদ্রলোক বুনো মোষের জিভের মতো বিরাট কালো জিভ বের করে বললেন, আমি করিনি স্যার, সব গুরুর কৃপা, কাকার কৃপা, বলে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে নমস্কার করলেন।

শিবেনবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ঐ হলো। অঙ্কটা বলুন না ?

তা পঁচিশ লাখ মতো হবে। সব খরচাখরচ বাদ দিয়ে। কাকার শ্রাদ্ধ, খুড়তুতো দু বোনের বিয়ে, আমার বিয়ে, খুড়তুতো ভাইদের বিয়ে আর গত পনেরো বছরের সংসার খরচ, ওষুধ-পত্র, সবরকম এজমালী খরচ ইত্যাদি।

—খরচপত্র কত হবে গত পনেরো বছরে ?

—খরচের চুলচেরা হিসেব তো রাখিনি। ভাগ্যিস রাখিনি। রাখলে তো পশ্চাতে হনুমান হয়ে যেতো আজ। ভাই-ভাইপোরা এ-নিয়ে মহা অশান্তি করছে। বলছে, আমি নাকি নিজে সবই একাই মেরে দিয়েছি। সে কারণেই হিসেব রাখিনি।

শিবেনবাবু অধৈর্য গলায় বললেন, আপনার পারিবারিক কথা শুনে আমি কি করব ? কি লাভ আমার ? যা জিজ্ঞেস করছি, তার জবাব দিন, যাতে আপনার কেস করতে সুবিধে হয়।

ভদ্রলোক বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার। বলছি। একটু ভেবে নিই।

শিবেনবাবু সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করলেন, আর একটা বের করে মক্কেলকে এগিয়ে দিলেন।

মক্কেল বললেন, অত দামী সিগারেট আমার চলবে না। আমি স্যার ব্যবসায়ী লোক, গরীব লোক, আপনাদের যা মানায় আমাকে কি তা মানায়? আমার ব্র্যাণ্ড এই। বলেই একটা সস্তা ও অত্যন্ত খারাপ ব্র্যাণ্ডের সিগারেট বের করে ধরালেন। ধরিয়ে দুর্বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, মাসে দশ হাজার সংসার খরচ ধরুন গড়ে—গত পনেরো বছরে—পনেরো বাই বারো—তা আঠারো লাখ। আর অন্যান্য খরচ ধরে তা সবসুদ্ধ লাখ তিরিশ হবে।

শিবেনবাবু বললেন, তাহলে গত পনেরো বছরের মধ্যে আয় ছিল পঁচিশ প্লাস আঠোরো লাখ, মানে তেতাল্লিশ লাখ।

ভদ্রলোক সিগারেটে টান দিতে দিতে বললেন, আসলে পঞ্চাশই ধরুন—কারণ আরও কিছু খরচা খরচ ছিল এদিক-ওদিক—যা মনে পড়ছে না বা বলা যাবে না।

—তাহলে পঞ্চাশ লাখ। শিবেনবাবু বললেন।

—আজ্ঞে।

—ট্যাক্স দিয়েছেন কত টাকার উপর গত পনেরো বছরে?

—প্রথম দিকে খুবই কম। ইদানীং পঁচিশ-তিরিশ হাজার। তা সবসুদ্ধু প্রায় লাখ দুয়েক টাকার উপর হবে পনেরো বছরে। মক্কেলের গলায় গর্বের সুর লাগল।

শিবেনবাবু অবাক গলায় বললেন, আয় আর ট্যাক্সের মধ্যে তো কোনো রকম সংগতিই দেখছি না। আপনি তো পুকুর-চুরি করেছেন মশায়!

মক্কেল নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, স্যার আমি পাঠশালার পোড়ো নই, আমাকে এসব ব্যাপারে জ্ঞান দেবেন না। এলেম ছিল, চুরি করেছি। অনেস্টির চেয়ে ডিস-অনেস্টিতে এলেম বেশী লাগে স্যার।

এবার ভদ্রলোকের গলার স্বরে ঝাঁঝ লাগল। তারপর বললেন, ট্যাক্স দেবো কেন? সরকার ট্যাক্সের বদলে কি দেয়? এ আমার হক্কের টাকা, মেহনতের টাকা, মাটিতে চট পেতে হাতবাক্স সামনে নিয়ে বসে কামানো টাকা। বর্গীর খাজনা দেবো কোন্ দুঃখে?

শিবেনবাবুকে চিন্তান্বিত দেখালো। বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু এখন তো ইনকাম ট্যাক্স, ওয়েলথ ট্যাক্স, নানা রকম পেনাল্টি, নানারকম ইন্টারেস্ট, সরকারের কাছে যে দেনার দায়ে নীলামে চড়বেন। তার কি হবে?

সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে গুঁজে রেখে ভদ্রলোক বললেন, তাহলে আর আপনার কাছে এলাম কেন? যাতে নীলামে না যাই তাই দেখাই ত আপনার কাজ। ফীস্, যা চাইবেন পাবেন, কিন্তু আমার কাজ হওয়া চাই।

মক্কেলের এই কর্তৃত্বে শিবেনবাবুর আমিত্বে ঘা লাগল। প্রায় চটেই উঠে-ছিলেন, কিন্তু এত বড় মক্কেল, নিজেকে সামলে নিলেন। মুখে কিছু বললেন না।

মক্কেল শিবেনবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে স্যার। আপনাকে বাঁচাতেই হবে আমাকে—নইলে এলাম কেন এখানে? গুরুর দয়ায় কামিয়েছি, গুরুই বাঁচাবেন, বাঁচার পথ বাৎলে দেবেন।

শিবেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি ওঝাও নই, ম্যাজিসিয়ানও নই, গুরু তো নই-ই। আমি একজন সামান্য উকিল। চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু কি করে আপনাকে বাঁচাবো জানি না।

উনি বললেন, উকিলবাবু, আমার ঠাকুর্দা বলতেন, যতক্ষণ না হাঁড়িতে ভাত চমানো হয়ে যাচ্ছে—ততক্ষণ সেই হাঁড়িকে নিয়ে যা খুশী করা যায়।

শিবেনবাবু ওঁর ফোয়ারার মতো কথায় সায় না দিয়ে, ভদ্রলোকের কাছ থেকে

জিজ্ঞেস করে করে একটা বংশলতিকা বানিয়ে ফেললেন। তারপর বাড়ির সমস্ত বিবাহিতা মেয়েদের নামে একটা করে পিটিশান তৈরী করলেন, ডিকটেশান দিয়ে। যাতে গয়নার ভাগটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

অনেকক্ষণ ধরে ডিকটেশান শেষ করার পর মক্কেল একটু কাশলেন।

বললেন, স্যার, আপনি যা করলেন, তাতে অসুবিধা হবে।

—কেন ?

—আমি চাই না আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা এই গয়নার কথা জানুক।

শিবেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, তাহলে বাঁচবেন কি করে ?

মক্কেলের মুখে একটি দেব-দুর্লভ হাসি ফুটে উঠল। বললেন, আছে স্যার। পথ আছে। আমি বাৎলে দিচ্ছি।

—কি পথ ? শিবেনবাবু ভুরু কুঁচকে শুধোলেন।

—স্যার, আমার এক শালী বিলেতে আছে। তার স্বামী ডাক্তার। আজকাল আমাদের দেশে তো বিদ্যে-শিক্ষের ছড়াছড়ি পড়ে গেছে—বড় দুর্দিন আমাদের। চারপুরুষে যা কামিয়ে গেছেন, এই এক পুরুষে তা ফুঁকে দেবে, কুঁজোর জল গড়িয়ে খেলে কি বেশিদিন চলে ?

যাই-ই হোক, শালীর কাছ থেকে এ্যাফিডেবিট আনাবো যে বিলেতে যাবার আগে তার যাবতীয় গয়না সে আমার স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রেখে গেছিল। সাদা-সাহেবদের সীল-মারা এ্যাফিডেবিট অবিশ্বাস করে, এমন হাকিম এ-দেশে নেই। তাছাড়া আমার শাশুড়ী মারা গেছেন গত পূর্ণিমাতে। ব্যাক-ডেট দিয়ে স্ট্যাম্প কিনে রেখেছিলাম—সলিসিটর বন্ধু আছে একজন আমার। তাঁকে দিয়ে উইল করিয়ে নেবো যে, তাঁর গয়না আমার স্ত্রীকে দিয়ে গেছেন।

শিবেনবাবু বললেন, আপনার শ্বশুরবাড়ির লোক জানতে পারলে ? তাঁদের যদি হাকিম সমন করেন ?

—কিছুই হবে না। তারা এসে কবুল করে যাবে। আসলে ব্যাপারটা কি জানেন ? আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার স্ত্রী ছাড়া সকলেই বিদ্যে-শিক্ষের বড় ভক্ত। সকলেই চাকরী করে, বি-এ, এম-এ পাস, ডাক্তার-এনজিনীয়র। তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু ক্যাশ ছেড়ে দেবো—তাহলেই হবে।

বলেই, একটু হাসলেন ভদ্রলোক। বললেন, কিছু মনে করবেন না স্যার, টাকার মতো আঠা আর নেই। সব ছ্যাঁদাই এতে বোজে। মোক্ষম আঠা।

শিবেনবাবু ভাবছিলেন, এরকম মক্কেল তাকেই চালিত করতে পারে, তাঁর মতো উকিলের কোনো দরকার ছিলো না এঁর। তবুও কেন যে ইনি এলেন, ভেবে পেলেন না শিবেনবাবু। শিবেনবাবুর মাথা থেকে এমন সব ব্রিলিয়ান্ট দুর্বুদ্ধি বেরুত না।

একটু চুপ করে থেকে শিবেনবাবু বললেন, তাহলে যা করবেন ঠিক করেছেন, তাই-ই করুন। এ্যাফিডেবিট আর উইল আমাকে দেখিয়ে যাবেন তৈরী হলে।

মক্কেল নিরাশ হয়ে বললেন, আপনি ড্রাফট করে দেবেন না ? এর জন্যে যা আলাদা ফীস্ লাগে আমি দেবো। সেদিন তো আপনি টাকা নিলেনই না। এই রাখুন স্যার, অন অ্যাকাউন্ট—বলে দু হাজার টাকা বের করলেন ভদ্রলোক।

শিবেনবাবু টাকার বাণ্ডিল দুটোর দিকে চেয়েছিলেন। ভাবছিলেন, উনি ঠিকই বলেছেন—টাকার মতো আঠা আর নেই। বিবেক, মান, সম্মান, শুভাশুভবোধ সবকিছুর ছ্যাঁদা এতে সত্যিই বুঝি বুঝে যায়।

মক্কেল বললেন, কম হলো স্যার? আরো দেবো? টাকার জন্যে ভাববেন না—যা লাগে, যত লাগে দেবো—শুধু আমার কাজটা হওয়া চাই। কাজের লোককে খাতির করতে জানি আমি। কাকা আর গুরুদেব এই শিক্ষাই দিয়েছেন আমকে।

বলেই বললেন, এ টাকার রসিদ করবেন না কিন্তু।

—সে কি? শিবেনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, পুরো না হয় করব না, কিন্তু রসিদ করব না তা কি হয়? পনেরো শো টাকার রসিদ করি, পাঁচশো এমনিই দিন, কেমন?

ভদ্রলোকের পা যেন কেউ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিলো। লাফিয়ে উঠে বললেন, মরে যাবো স্যার, একেবারেই মরে যাবো। আপনি না হয় আরো কিছু নিন, কিন্তু পুরো পনেরো শো-র রসিদ করলে বাঁচব না। এক নম্বর খাতায় ক্যাপিটাল কোথায়? এক নম্বরে এতো টাকা দেবো কি করে?

শিবেনবাবু বললেন, তা বলে আমিই বা দু নম্বর টাকা এতো নিয়ে করব কি? দু নম্বর টাকায় ইলিশ মাছ আর হুইস্কি খাওয়া ছাড়া আর কি করার আছে? ইলিশ মাছ আমার ভালো লাগে না, তাছাড়া হুইস্কি আমি কখনও নিজের পয়সায় খাই না। অন প্রিন্সিপাল।

মক্কেল হাসলেন। তারপর চোখদুটোকে গাড়ির হেড লাইটের মতো ডিমার থেকে ডিপার করে বললেন, স্যার, আরো কত কি করার আছে! আমাকে টাকা দিন না, কোলকাতা শহরে এক দিনে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করে দেবো—খরচটা স্যার কিছু না—কামানোটাই আসল।

শিবেনবাবু তবুও বললেন, না না। আমি তা পারবো না। রসিদ দেবোই। তবে এতো করে যখন বললেন, তখন হাজার টাকার রসিদ নিন।

—মরে যাবো স্যার। একেবারে মরে যাবো। ওটাকে পাঁচশো করুন। পাঁচশো এক নম্বরে, পনেরো শো দু নম্বরে।

শিবেনবাবু স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে যত্নসহকারে ইনকামট্যাক্স অফিসারের কাছে চিঠি করালেন খাতাপত্র ইনসপেকশানের জন্যে।

চিঠিটা আধাআধি হওয়ার পরই মক্কেল বললেন, স্যার, ও চিঠি দেওয়া হয়ে গেছে। আপনি কষ্ট করবেন না।

—কবে? শিবেনবাবু অবাক হলেন।

—যেদিন আপনার কাছে এসেছিলাম তার পরদিনই। খাতা ইনসপেকশানের ও নকল করার দিন দিয়েছেন হাকিম আগামী বৃহস্পতিবার। আপনি স্যার একটু সকাল করে সেদিন যাবেন—আমি আবার বারবেলাটাকে বড় ভয় পাই।

শিবেনবাবু বড় বিরক্ত বোধ করছিলেন। বললেন, কে ঐ চিঠি করে দিলেন?

মক্কেল বললেন, নগেন মুখুজ্জ্যে।

—নগেন মুখুজ্জ্যের খবর আপনি জানলেন কি করে? শিবেনবাবু অবাক হয়ে শুধোলেন।

—স্যার, সব খবরই আমাদের রাখতে হয়। আপনি রাগ করলেন? এত বড় গর্তে পড়েছি আর বাজার যাচাই করিনি? তা কি হয়?

শিবেনবাবুর গত শুক্রবারে ট্রাইব্যুনালের ঘটনা মনে পড়ে গেল। নগেনদার জন্যে মনটা সেদিন থেকে খারাপ হয়েছিল। বললেন, না না। বেশ করেছেন। আমি তো ও'র জুনিয়রই ছিলাম। ও'কে কেন এই কেসে সিনিয়র হিসেবে

এনগেজ করছেন না? আমার তাতে কোনোই আপত্তি নেই। বরং খুশীই হবো।

—কী যে বলেন স্যার? সব খবরই আমরা রাখি। উনি বিদ্বান লোক, পণ্ডিত লোক, কিন্তু ঐ নেপথ্যেই উনি ভালো। উনি মেঘনাদ-বধ বাণ-স্পেশালিস্ট। সম্মুখসমরে ওঁকে আনলেই কেস গড়বড়। বাড়ির বউ ভালো রাঁধে বলে কি আপনি তাকে হাটের হোটেলে রান্না করতে নিয়ে যাবেন?

—মানে? উপমা দেখে শিবেনবাবু আঁতকে উঠলেন।

শিবেনবাবু এই মক্কেলকে মিট করার পর থেকে কেস সম্বন্ধে যত না ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন মক্কেল সম্বন্ধে তার চেয়ে অনেক বেশী। লোকটা কি মতলবে তাঁর কাছে এসেছে তা উনি এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। সন্দিগ্ধ চোখে মক্কেলের দিকে চেয়ে উনি আবারও বললেন, তার মানে?

মক্কেল বললেন, স্যার, আপনাকে সবাই ভালোবাসেন, খাতির করেন, আপনি কখনও ফোঁস করেন না, গুঁতো মারেন না কাউকে, হেসে কথা কন, মক্কেলদের সঙ্গে টাকাপয়সা নিয়ে জোরাজুরি করেন না, বলেন কনও মোটামুটি—আপনাকে পাঠাবো বাহির যুদ্ধে—আর মেঘের আড়ালে থাকবেন নগেন স্যার। এ নগেন-শিবেন কম্বিনেশন তো নয়, একেবারে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন সহযোগিতা। কি বলেন, স্যার?

শিবেনবাবুর বলার মতো বিশেষ কিছুই ছিলো না তখন। চুপ করেই রইলেন তিনি।

মক্কেল বললেন, আজ তাহলে উঠি।

—দাঁড়ান। রসিদ নিয়ে যান। বলে, শিবেনবাবু রামুকে ডেকে রসিদ করে দিতে বললেন।

রামু রসিদ এনে দিতেই উনি বললেন, একটা কথা স্যার?

শিবেনবাবু বললেন, বলুন।

রামু ঘর থেকে চলে যাওয়া অবধি অপেক্ষা করেই মক্কেল বললেন, যে খাতা-পত্র ধরে নিয়ে গেছিলেন ডিরেকটেরেটের লোকেরা সেগুলো তো ইনকামট্যাক্স অফিসারের জিম্মায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ওঁরা, নোট-টোট দিয়ে। ঐ খাতাগুলো কোনো রকমে সরানো যায়? মানে যাকে বলে গায়েব-করা?

শিবেনবাবুর মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

খুব রেগে উঠে বললেন, তার মানে? আপনি কি এখানে এসেছেন আমাকে অপমান করতে? আপনি যেরকম উকিল খুঁজছেন তেমন উকিল পাবেনও হয়তো শহরে, কিন্তু এখানে সুবিধে হবে না। আপনি আপনার টাকা ফেরৎ নিয়ে চলে যান।

মক্কেল হাসলেন।

মনে হলো কোনো খুনী হাসলো।

তারপর বললেন, আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছিলাম তা ঠিকই। আপনি বড় সহজে চটে ওঠেন। বড় সরল। আর আপনার রসবোধও কম। একটু রসিকতাও কি করতে পারি না? ঠাট্টা করে একটা কথা বললাম, আর আপনি...

শিবেনবাবুও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। এই জন্যেই তো তাঁর যা হবার ছিল তা হলো না। মাঝে মাঝে তাঁর মাথাতেও নগেনদার ভূত চাপে। হাজার হোক তাঁর কাছেই তো কাজ শেখা। যাই-ই হোক, ব্যাপারটা আর গড়াল না, এই-ই যথেষ্ট। এই বাজারে এমন একজন মক্কেল! আর তিন-চার মাসের

মধ্যেই ছোট বোন মিনুর বিয়ে। কথা প্রায় পাকা হয়ে আছে। শিবেনবাবুর এই শেষ কাজ। প্রেম-ট্রেম করতে পারলো না মেয়েটা। শেষ সেই শিঙাড়া-রসগোল্লা খেয়ে গান শুনে, চুল দেখে সম্বন্ধ করেই বিয়ে ঠিক হলো। ছেলে একটা বড় মার্কেন্টাইল ফার্মের এ্যাসিস্ট্যান্ট পারচেজ ম্যানেজার। রোজগার ভালো। শুনেছেন উপরিও ভালো। সাপ্লায়াররা খাতিরে রাখে সবসময়। এমন পাত্র হাতছাড়া করেননি শিবেনবাবু। মিনুর বিয়ের আগে এই সার্চ এ্যান্ড সিজার কেসটার একটা নিষ্পত্তি করতে পারলে কোনো চিন্তা থাকে না। এক নম্বর দু নম্বরে যা খরচা তার সবই এই কেস থেকেই উঠে আসবে। অবশ্য খাটতেও হবে অনেক। একবার কাজ শুরু হলে এক দুমাস এই নিয়েই ল্যাজে-গোবরে হয়ে যেতে হবে। খাতা ইনসপেকশান করে কপি নিয়ে তা থেকে কি বেরোয় দেখা যাক।

মক্কেল বললেন, জোড়-হাত কপালে ঠেকিয়ে, তাহলে উঠি আজকে। বৃহস্পতিবার তাহলে হাকিমের কাছে সকাল সকাল যাওয়া যাবে। আপনাকে আমি তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে।

শিবেনবাবু বললেন, খাতা ইনসপেকশান ও কপি করার সময় আমার থাকার কি দরকার? ঐদিন আমার জুনিয়র রামুই যাবেখন।

মক্কেল কি একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, বেশ, তাই-ই হবে।

মক্কেল বেরিয়ে গেলে শিবেনবাবু দেখলেন কাঁচের ফাঁক দিয়ে রামুর সঙ্গে কীসব কথা-টথা বলে রামুর হাতে কী যেন গুঁজে দিলেন তিনি।

রামু উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকলো।

বলল, কি ব্যাপার শিবেনদা? এমন ভগবানের মতো মক্কেল দেখিনি। আমার হাতে জোর করে পাঁচশো টাকা দিয়ে গেল। বলল, স্যার তো দেখছেনই, আপনিও একটু দেখবেন।

—এই বাজারে পাঁচশো টাকা উইন্ডফল—মন্দ কী? শিবেনবাবু বললেন রামুকে হাসতে হাসতে।

রামু শিবেনবাবুর টেবল থেকে সিগারেটের প্যাকেট উঠিয়ে নিয়ে বলল, না, শিবেনদা, আমার মন ভালো বলছে না। লোকটার চেহারাই বলে এ বড় ঘোড়েল লোক। এর কাজ সাবধানে করবেন।

শিবেনবাবু হাসলেন। বললেন, তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী। ভদ্রলোক খুব ইন্টারেস্টিং। বিচক্ষণ। কিন্তু মানুষ খারাপ নন।

রামু বলল, আমার কিন্তু সন্দেহ হয়। বৌদিকে একবার দেখালে হতো এঁকে।

শিবেনবাবু হেসে উঠলেন।

রামুও হাসছিল। বলল, ঠাট্টা নয়। আমার ধারণা বৌদি আপনার চেয়ে লোক ভালো চেনেন।

সানু এসেছিল সেদিন সন্ধ্যের পর। ওকে ঢুকতে দেখেই শিবেনবাবুর পিত্তি জ্বলে গেল। সানু উইদাউট এনি সেরিমনি শিবেনবাবুর ঘরে ঢুকে বলল, আমার তাড়া আছে শিবু কাকা, টাকাটা ছাড়ো।

শিবেনবাবুর মনে হলো এক চড় মারেন সানুকে। ভাবলেন, নগেনদার মতন আত্মসম্মান-জ্ঞানী লোকের এমন ছেলে হলো? মুখে কিছু না বলে বললেন, বাবা কেমন আছেন?

—বাবা? সানু অবাক হয়ে প্রশ্ন করল, যেন শিবেনবাবুর এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।

বলল, বাবার খুব জ্বর পরশু থেকে। উল্টোপাল্টা বকছে। ইংরিজী আওড়াচ্ছে।

—কি ইংরিজী?

—আমি কি বাবার ইংরিজী বুঝি? ওসব বড় বড় পণ্ডিতী ব্যাপার। অত ফাণ্ডা থাকলে তো আই-এ-এস, আই-আর-এস পরীক্ষাতেই বসতাম।

—তোমার এ-চাকরিতে মাইনে কত? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—মাইনে বেশী নয়, তবে সরকারী হাসপাতাল তো! হাসপাতালের দুধ, মাছ, ওষুধ ইনজেকশান ঝেড়ে রোজগার মন্দ নয়। সব মিলিয়ে চলে যাবে কোনোরকম।

শিবেনবাবু ওর সঙ্গে কথা আর বাড়াতে চাইলেন না। ড্রয়ার খুলে টাকাটা দিয়ে দিলেন।

সানু হাসল। বলল, খুব বিরক্ত বোধ করছ, না? ওয়ার্ডবয়ের উপরি রোজগার থাকলে, কনস্টেবল চার আনা ঘুষ নিলে তোমাদের ভুরু বিরক্তিতে কুঁচকে ওঠে। তোমাদের মুখে ভুরুই আছে, চোখ নেই? চোখের মণি নেই? তোমরা শুধু ছোট চোরদেরই দেখতে পাও—আমার মতন ওয়াইপার চোরদের। আর যারা দিনে-দুপুরে ডাকাতি করছে তাদের দেখো না তোমরা। তাদের মদত দাও।

শিবেনবাবু বললেন, বাড়ি ফিরতে দেরী কোরো না। বাবাকে কে দেখছেন? ডাক্তার দেখিয়েছ?

সানু বলল, কোনো গরু-মোষের ভেট্‌কে ডাকা উচিত ছিল, মানুষের ডাক্তারে বাবার কি করবে? বাবার সিসটেমটাই মানুষের মতন নয়। বাবা তো একটা রেয়্যার এ্যানিম্যাল। জাতটাই একস্টিংট হয়ে যাচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বলল, তারিণী কবিরাজ দেখছে। সাল্‌সা-টাল্‌সা দিয়েছে। বলেছে, ভাল হয়ে গেলেই ভাল হয়ে যাবে।

শিবেনবাবু বললেন, তারিণী কবিরাজ কে আমি জানি না। তবে, প্রয়োজন মনে করলে আমাকে জানিও। আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছেন, তাকে নিয়ে যাবো। খুব ভালো ডাক্তার।

সানু বলল, প্রয়োজন হলে সার্টেন খবর দেবো। তোমাকে দেবো না তো কাকে দেবো?

শিবেনবাবুর মন ভাল লাগল না। নগেনদার ছিট-কাপড়ের দোকান দেওয়ার সিদ্ধান্তটা তাঁকে বড় আপ্‌সেট করে দিয়েছিল।

সান্ চলে গেলে, শিবেনবাবু তাঁর পরিচিত ডাক্তারকে ফোন করলেন। পার্ক স্ট্রীটে চেম্বার। ডায়াগনোসিস খুব ভাল। বললেন, এক্ষুনি তোমার কাছে যাচ্ছি ভায়া, একটু যেতে হবে আমার সংগে।

শিবেনবাবু যখন ডাক্তার সেনকে নিয়ে নগেনদার বাড়ি পৌঁছলেন তখন রাত নটা। বৌদিই দরজা খুললেন।

শিবেনবাবু উৎকণ্ঠার সংগে বললেন, দাদা কেমন আছেন?

—ঐরকমই। জ্বরের মধ্যেও বক্তৃতার শেষ নেই। তারপর ক্লান্তি ও হতাশার সংগে বললেন, শিবু, আমি আর পারি না।

শিবেনবাবু বললেন, আমি একজন ডাক্তার এনেছি।

—ভাল করেছ।

—কবিরাজ কি ওষুধ দিয়েছেন?

—কবিরাজ? বৌদি আকাশ থেকে পড়লেন।

বললেন, কোনো কবিরাজ তো দেখেননি—কেউই দেখেননি—তেমন কোনো অসুবিধা তো নেই, কেবল জ্বর বেশী আর ভুল বকছেন একটু। সানু বোতলে করে কি এনে যেন খাইয়েছিল। বলেছিল, মা কালী মার্কা।

ডাক্তার সেন শিবেনবাবুর মুখের দিকে চাইলেন।

শোবার ঘরে একটা ঝুল-পড়া পনেরো পাওয়ারের বাতি জ্বলছে। দেওয়ালে দুটো টিকটিকি পোকা খেয়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের এক কোণায় লক্ষ্মীর পট—অন্য কোণায় জুতোর বাক্স। বাইরে কলতলায় জল পড়ার শব্দ।

নগেনদা শবাসনে শুয়ে ছিলেন।

শিবেনবাবু ডাকলেন, নগেনদা।

নগেনবাবু চোখ খুলে বললেন, কে? বলেই, স্পষ্ট কিন্তু মৃদু উচ্চারণে বললেন,

"Not I, not any one else can travel that road for you, you must travel it yourself. It is not far. ....it is within reach"

তারপর একটু যেন দম নিয়ে আবার বললেন,

"Shoulder your duds and I will mine, and let us hasten forth; wonderfull cities and free nations we shall fetch as we go."

শিবেনবাবু বললেন, ডাক্তার, তুমিও যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে, কিছু করো।

ডাক্তার সেন প্রেসার চেক করলেন। অনেকক্ষণ ধরে আরও নানারকম পরীক্ষা করে বললেন, চিন্তার কিছু নেই। বুকে ঠান্ডা লেগেছে। কিন্তু সেটা আসল অসুখ নয়। আসল অসুখ হাইপারটেনশান। জ্বরটা সারিয়ে নিয়ে ভাল করে চিকিৎসা করতে হবে। ঘুম হচ্ছে ওঁর আসল চিকিৎসা। চিন্তা, ভাবনা, উত্তেজনা কমাতে হবে। কোনো কিছু নিয়ে ওয়ারী করলে চলবে না।

ডাক্তার সেন প্রেসক্রিপশান লিখলেন খস্‌স খস্‌স করে।

তারপর প্রেসক্রিপশানটা শিবেনবাবুকে দিয়ে চলে গেলেন। তাঁর ফিয়াট-গাড়ির এঞ্জিনের হাই-গীয়ারের আওয়াজে ভরে উঠল গলিটা।

শিবেনবাবু নগেনবাবুর পাশে বসলেন। অনেক কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। অনেক পুরোনো কথা। প্রফেশানের গোড়ায় নগেনদাই তাঁকে শিখিয়েছিলেন, শুধু খাটলেই হলো না—প্রফেশানের সবচেয়ে বড় কথা শিবু, তুমি যে মক্কেলের জন্যে

খাটছো, ভাবছো, এ-কথাটাও মক্কেলকে কম্যুনিকেট করতে হবে। যে হাকিমের কাছে অ্যাপীয়ার করছো—সেই হাকিমের পয়েন্ট অফ ভিউ বুঝবার চেষ্টা করবে। ইউ শুড নো ইওর জাজেস বেটার দ্যান ইউ নো ইওর ল। কারণ মানুষই বিচার করবে—কমপ্যুটার নয়। যতদিন মানুষই জজসাহেব হবেন, ততদিন এইসব পার্সোনাল ফ্যাকটর, হিউম্যানিস্টিক এলিমেন্টস নিশ্চয়ই কাজ করবে।

অথচ সেই নগেনদাই আজকে যেন সব ভুলে গেছেন—যেখানে যান, সেখানেই ঝগড়া, সেখানেই আগুনলাগা বারুদের মতন জ্বলে ওঠেন। আশ্চর্য।

নগেনদা শিবেনবাবুর হাতে হাত রেখে বিড়বিড় করে আবার কি যেন বললেন। শিবেনবাবু কান পেতে শুনলেন :

"Dazzling and tremendous how quick the sunrise would kill me.
If I could not now and always send sunrise out of me."

শিবেনবাবু কাঁধের কাছে ঝুঁকে পড়ে বললেন, নগেনদা!

হঠাৎ পিছন থেকে সানুর গলা শুনলেন, থ্রি-চিয়ারস ফর সানরাইজ।

শিবেনবাবু পিছন ফিরে দেখলেন, রেসের বই হাতে সানু দাঁড়িয়ে আছে।

শিবেনবাবুকে দেখেই বলল, কাল তোমার পুরো টাকা সানরাইজেই খেলব। কাল যদি জ্যাকপট না পাই, তবে আমি নগেন মুখুজ্যের ব্যাটা নই—। তারপর দেখবে শিবুকাকা, তোমার মতন বড়লোক। হাঃ হাঃ!

শিবেনবাবু বললেন, সানু তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।

—আরে সাব্বাস! এ যে আমার লোক্যাল গার্জেন। হাতী ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল। বেশী পেঁয়াজী কোরো না শিবুকাকা, যাওয়ার সময় দেখবে চারটে টায়ারই ফ্ল্যাট। তোমার গুরুর সেবা করছো, করো। তোমার গুরু আশীর্বাদ দেবে। সেই আশীর্বাদে সোনা ফলবে।

শিবেনবাবু অবাক হয়ে সানুকে লক্ষ্য করছিলেন। হতবাক হয়েছিলেন তিনি।

বৌদি একবার ঘরে ঢুকে বার্লি অথবা হরলিকস—কিছু একটা খাইয়ে গেলেন নগেনদাকে। সানুকে দেখলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। শিবেনবাবুর মনে হলো, নগেনদার চেয়ে সানুর মূল্য ওঁর কাছে অনেক বেশী। সানু নতুন যুগের ছেলে, ও এই দুনিয়ায় ট্যাঁকসই হবে—ও ওর বাবার মতন অবুঝ হবে না—এমন একটা বোধ বোধহয় বৌদির মস্তিষ্কে কাজ করছিল, করছে।

শিবেনবাবু ভাবলেন, সানুকে প্রেসক্রিপশান দিয়ে পাঠানো বৃথা। হয়ত ওষুধ কেনার টাকাতে ও বাংলা খেয়ে আসবে।

বৌদিকে ডেকে, নগেনদার কাছে বসতে বলে, শিবেনবাবু ওষুধ আনতে গেলেন। বেশ কিছুক্ষণ পর মোড়ের দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে ফিরে এসে বললেন, কাল একটা ফোন করে দেবেন বৌদি আমায়। দাদা কেমন থাকেন না থাকেন জানিয়ে।

—ফোন তো নেই ঠাকুরপো। ফোন কেটে দিয়ে গেছে।

—অ। তাহলে আশে-পাশের কোনো বাড়ি বা দোকান থেকে করবেন অথবা সানুকে বলবেন।

—সানুকে? বলে বৌদি মাথা নীচু করলেন।

তারপর বললেন, তোমার কাছে বড় ছোট করলাম নিজেকে। ওঁর কাছে, তুমি চলে যাবার পরই বলেছিলাম যে তুমি ঐ পাঁচশ টাকা দেবে বলেছো সানুকে। শোনার পর যে কী করতে লাগলেন কি বলবো। সন্ধ্যে থেকে জ্বর এলো।

শিবেনবাবু বৌদিকে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, বৌদি আমি চলি। দাদার এখন ঘুমোনো দরকার। ডাক্তার বললেন, ঘুমই আসল ওষুধ।

বৌদি বললেন, একেবারেই ঘুম পাড়িয়ে দাও না শিবু। লোকটাও বাঁচে, আমিও বাঁচি। সানুকে, নিজের ছেলেকে লোকটা চিরদিন শত্রু বলে জেনে এল। তোমার দাদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

একটা আপীল ছিল।

শিবেনবাবু অফিস থেকে বেরোতে যাবেন, এমন সময় ফোন এলো।

রামু উত্তেজিত গলায় বলল, শিবেনদা?

—হ্যাঁ।

—আপনি এক্ষুনি আসুন। আপনার ভালোমানুষ মক্কেল কী করেছেন দেখবেন আসুন। একটুও দেরী করবেন না।

আপীলে যাওয়া হলো না শিবেনবাবুর। তাড়াতাড়ি গাড়ি নিয়ে অন্য অফিসে পেঁছিলেন। পেঁছে দেখেন হুলস্থুল কাণ্ড। লোকজন দৌড়াদৌড়ি করছে—সকলেই প্রচণ্ড উত্তেজিত। অন্যান্য অফিসের লোকেরাও ভীড় জমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কী যে হয়েছে তা বোঝা গেল না।

হাকিমের ঘরে ঢুকতেই শিবেনবাবু দেখলেন, হাকিম জাম্পিং-বীনের মতন লাফাচ্ছেন। এ-হাকিমের সঙ্গে শিবেনবাবুর আলাপ ছিল না, আগে দেখেনওনি কখনও। ভদ্রলোক উত্তেজিত গলায় শিবেনবাবুকে বললেন, নিন্, এখন বাঁচান আপনার মক্কেলকে।

কিন্তু মক্কেল কোথায়? তাঁকে ত্রিসীমানাতেও দেখা গেল না। তাঁর একজন মুহুরী যিনি খাতা কপি করছিলেন, তিনি স্থির স্তব্ধ নেত্রে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছেন—মহাদেবের মতন ভাবগম্ভীর; বাক্যহীন।

শিবেনবাবু চেয়ারে বসে বললেন, কী হয়েছে? মক্কেলই বা কোথায়?

রামু দৌড়তে দৌড়তে এলো। বলল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

চার-পাঁচজন লোক মক্কেলকে নিয়ে সেই সময় হাকিমের ঘরে ঢুকলেন।

পারলে হাকিম মক্কেলকে নুন কাঁচালঙ্কা দিয়ে চিবিয়ে খেতেন তখন।

হাকিম অন্য সকলকে ঘর থেকে বার করে দিয়ে শিবেনবাবুকে বললেন, খাতা কপি করতে করতে সিন্দুক-খাতার আসল মূলধন হিসাবের পাতাটি ছিঁড়ে ফেলে উনি এক দৌড়ে পালিয়ে গেছিলেন। কাণ্ড দেখেছেন মশায়! এ লোক তো মানুষ খুনও করতে পারে! আমার চাকরি কি আর থাকবে?

তারপর দম নিয়ে বললেন, যাই-ই হোক, আমি পুলিশে ফোন করছি—এঁকে আমি জেলে দেবো—তারপর অন্য কথা।

মক্কেলকে পাবলিক ইউরিন্যাল থেকে ধরে এনেছিল হাকিমের অফিসের লোকেরা।

হাকিম ধমকে বললেন, খাতার পাতা কোথায়? বলুন শীগগির।

মক্কেল উল্টো ধমক দিয়ে বললেন, কী যা-তা বলছেন স্যার! পাতা কোথায় তার আমি কি করে জানব? আমিও রেসপেকটেবল লোক। ট্যাক্সপেয়ার। আপনার সমান মাইনে পায় এমন বহু চাকর আমার আছে। ভদ্রভাবে কথা বলুন।

হাকিম শিবেনবাবুকে বললেন, শুনছেন ত, এখনও আপনার মক্কেলকে সত্যি কথা বলতে বলুন, বিহেভ করতে বলুন প্রপারলি, নইলে কিন্তু খারাপ হয়ে যাবে।

শিবেনবাবু বড়ই বিপদে পড়লেন। নতুন মক্কেল, কিন্তু শাঁসালো মক্কেল। এগোলেও নির্বংশ, পেছোলেও নির্বংশ। তবুও বললেন মক্কেলকে উদ্দেশ করে,

দেখুন মশায়, আপনাকে আমি তেমন ভাল চিনি না, কিন্তু আপনি যদি আমার কাছেও সত্য গোপন করেন তাহলে কিন্তু আমার পক্ষে আপনার কেস করা সম্ভব হবে না। এই আমি আপনার ওকালতনামা ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছি।

মক্কেল এক মুহূর্ত কী ভাবলেন, হাকিমের মুখে ও শিবেনবাবুর মুখে একবার চাইলেন, তারপর ভেজা বেড়ালের মতন বললেন, স্বীকার করছি যে, পাতা ছিঁড়েছিলুম।

হাকিম উত্তেজনায় লাফ দিয়ে উঠলেন।

শিবেনবাবুকে বললেন, দেখলেন তো, দেখলেন, কী সাংঘাতিক কান্ড!

পরক্ষণেই বললেন, ছিঁড়ে তো ফেললেন, কিন্তু সেই ছেঁড়া পাতাটি কোথায়?

মক্কেল 'হাত ঘোরালে নাড়ু পাবে' দেখানোর মত করে হাত ঘুরিয়ে বললেন, নেই।

—নেই মানে? হাকিমের মুখ রাগে এমন লাল হয়ে উঠল যে, মনে হলো এক্ষুনি উনি ফেটে যাবেন।

মক্কেল নিরুত্তাপ গলায় হাকিমের সমস্ত উত্তেজনা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে বললেন, সত্যিই নেই; খেয়ে ফেলেছি। ছেল, কিন্তু নেই।

—এ্যাঁ? খেয়ে ফেলেছেন? এ কি পাঁপড় ভাজা? চকোলেট? এত বড় ভারী ও মোটা কাগজের খেরোর পাতা কেউ খেতে পারে, না খাওয়া সম্ভব? খেয়ে ফেলেছেন বললেই হলো? চালাকি পেয়েছেন?

মক্কেল বললেন, বিশ্বাস করুন স্যার, ছোটবেলায় আস্ত কাঁঠাল, আস্ত পাঁঠা খেয়েছি—সত্যিই খেয়ে ফেলেছি।

হাকিম দুই হাত ও দুই পা চারটি বিভিন্ন দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হতাশ ভঙ্গিমায় পোড়ো বাড়ির খসে-যাওয়া আলসের মতো বসে পড়লেন চেয়ারে মাথায় হাত দিয়ে।

মুখে বললেন, ডেঞ্জারাস দ্যান আ সার্পেন্ট। ঈস-স-স-স।

তারপর বললেন, লিখে দিন যে, আপনিই ছিঁড়ে ঐ পাতা খেয়ে ফেলেছেন।

মক্কেল নিরুত্তাপ গলায় বললেন, কোন্ দুঃখে? এমনিই বললাম। আসলে আমি কিছু জানি না। প্রমাণ কি যে আমি ছিঁড়েছি?

—দেখুন মশায়! বলেই, হাকিম চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মক্কেল নির্বিকার ভঙ্গিমায় বললেন, অত মেজাজ দেখাবেন না স্যার। যা হবার তা হয়ে গেছে। ঐ পাতাটিতেই সব হিসেব ছিল, ওটি আর এখন নেই। অতএব আপনি চেঁচান আর গালাগালিই দিন আমার চুলটি স্পর্শ করার জো নেই আপনার। এখন যা পারেন করুন আপনি। খাতা কপি করার দরকার আমার আর নেই। এই আমি চললুম। থাকল আপনার খেরো খাতা।

হাকিম মক্কেল ও শিবেনবাবুকে কামড়ে দেবার মত করে বললেন, লজ্জা করে না, লজ্জা করে না আপনার? এ রকম মক্কেল?

শিবেনবাবু দেখলেন যে উত্তেজনায়, রাগে, অপমানে অল্পবয়সী হাকিমের চোখে জল এসে গেছে।

শিবেনবাবু মাথা নোয়ালেন। তারপর মাথা নাড়িয়ে বললেন, করে। মানে সত্যিই করছে। কিন্তু লজ্জা পাওয়া ছাড়া আমার করার আর কিছুই নেই।

হাকিমের ঘর থেকে বেরিয়ে শিবেনবাবুর মনটা বড়ই ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। গাড়িতে উঠে রামুকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছিলে। আমি লোক চিনি না। যখন খাতা সরাবার প্রস্তাব করেছিলেন আমার কাছে ভদ্রলোক তখনই ও'র চরিত্র

বোঝা উচিত ছিল আমার।

রামু বলল, ওকে আর ভদ্রলোক বলবেন না শিবেনদা। টাকা থাকলেই ভদ্রলোক হয় না। এদের চাবকানো উচিত।

শিবেনবাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, কিন্তু চাবকাবে কে? ওরাই যে সমস্ত পৃথিবীকে টাকার চাবুক মেরে চুপ করিয়ে রেখেছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে শিবেনবাবুর হঠাৎই মনে হলো, ঐ মক্কেল বলেছিলেন—স্যার, টাকার মত আঠা আর নেই—এ আঠায় পৃথিবীর সব ছ্যাঁদাই বুজে যায়।

মিনুর বিয়ের ব্যাপারে এই একটা বড় কেসের উপর অনেক আশা করেছিলেন শিবেনবাবু। মনটা খারাপ লাগল। তবে পরক্ষণেই, একটা সাংঘাতিক লোকের সংস্পর্শ থেকে মুক্ত যে হয়েছেন, একথা জেনে ভালও লাগল।

আপীলে আর গেলেন না সেদিন। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে জানতেন, ফোন করে বলে দিলেন যে আগামীকাল যাবেন। চেম্বারে ফিরে রামুকে নিজের কিউ-বিক্‌লে ডেকে কফি আনতে বললেন। বেচারা হাকিমের সমস্ত উত্তেজনা এতক্ষণ পর শিবেনবাবুর বুকে ফিরে এসেছে।

কফি খাচ্ছেন এমন সময় দেখলেন সেই ক্ষণজন্মা মক্কেল আসছেন। তিনি না-বলে-কয়েই শিবেনবাবুর ঘরে ঢুকে পড়লেন। তারপর ভদ্রতার ও বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বললেন, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমায় মাপ করবেন। আর আপনাদের কাউকেই দরকার হবে না। যিনি আমার কেস করতেন তিনিই এবার থেকে সব কিছু করবেন। ঘর-ঘরোয়া ব্যাপার। তবে একটা কথা বলে যাই—যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনারা চলছেন না—যে কাজটা আমি করলাম সেটা আপনি করলে মোটা টাকা পেতেন। যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারছে না বলেই বাঙালীরা পেছিয়ে পড়ছে। আর একটু প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে। মক্কেলের কাজ করতে হবে যেন-তেন-প্রকারেণ—। তবে না মক্কেল টাকা দেবে? মোটা মোটা বই দেখিয়ে আইন কপ্‌চিয়ে ওকালতী করার দিন চলে গেছে।

তারপরই নিজের প্রকান্ড মাথায় আঙুল ঠেকিয়ে বললেন, এইটে ব্যবহার করুন। কলকাতা শহরে টাকা গুবড়ে ফড়িং-এর মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। হাত বাড়ালেই খপ—খপ্পাখপ্। বুয়েচেন।

বলেই মক্কেল শিবেনবাবুর টেবল থেকে কাগজপত্র তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

অনেক—অনেকক্ষণ শিবেনবাবু রামুর হতভম্ব মুখের দিকে চেয়ে হতবাক হয়ে বসে রইলেন চেম্বারে।

বুধমল এসে শিবেনবাবুর ঘোরাবস্থা কাটাল।

বলল, হোয়াটস রং ব্যানার্জী সাহাব?

শিবেনবাবু আর রামু চমকে চেয়ে দেখলেন বুধমল দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ইম্পোর্টেড ছিটের ফ্লেয়ার, গায়ে চকরা-বকরা হাওয়াইন শার্ট, হাতে দুটি ফাইল। বুধমলের আপাদমস্তক কিছুই ভারতীয় নয়। জুতোটা ছাড়া। মায় চশমা কলম সিগারেট সিগারেট-লাইটার পর্যন্ত। এরাই হিপ-পকেটে একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল ফেলে নিউ মার্কেটে মার্কেটিং করে বেড়ায়, এরাই মডার্ণ ইণ্ডিয়ার ট্রেডিং বিজনেসের প্রতিভূ। এদের দেখলে কে বলবে দেশে অভাব আছে, অসুবিধা আছে কোনো রকমের!

বুধমল চেয়ার টেনে বসে, একটা বিলীতি সিগারেট এগিয়ে দিলো রামু ও শিবেনবাবুর দিকে। ধরিয়েও দিলো।

সেই মুহূর্তে শিবেনবাবুর মনে মক্কেল জাত সম্বন্ধে একটু গভীর অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ গেঁথে গেছিল। ও'র নিজেরই মনে হচ্ছিল যে, এ সন্দেহ বেশ কিছুদিন থাকবে।

বুধমল বলল, একঠো আপীল হ্যায় পড়শু। রিলিফ লেনা হ্যায়।

রামু বলল, দাদা আপনি কাজ করুন, আমিও একটু কাজ করি।

বলে উঠে গেল।

শিবেনবাবু বুধমলকে বললেন, কাগজপত্র দাও।

বুধমল কাগজপত্র এগিয়ে দিল। ও যেহেতু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইন্টার-মিডিয়েট কমার্স পড়েছিল এক বছর, ওর ধারণা ইংরিজী ভাষাটা ও সম্পূর্ণভাবে রপ্ত করে ফেলেছে। তার ফলে হাকিমের সঙ্গে তার যে চিঠিপত্রাদি বিনিময় হয়েছে তার মর্মোদ্ধার করা শিবেনবাবুর পক্ষে সম্ভব হলো না।

কিছুক্ষণ ক্রিয়াপদশূন্য, টেন্সহীন ইংরিজী পড়ে নিজেই অত্যন্ত টেন্স্ হয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল ভালো করে বলো, মুখেই বলো।

বুধমল বলল, কুছ উচান্টির রুপেয়া খাতায় ঢুকিয়েছিলাম বোগাস নামে। কনফারমেশান লেটারভি দিয়ে দিয়েছিলাম—বোগাস ফাইল নাম্বার দিয়ে রাজস্থানের। আই টি ও-র ভেরিফিকেশানের জন্য। ইনফরমেশান স্লিপভি পাঠিয়েছিলেন তিনি।

তারপর বুধমল যা বলল তার সারার্থ হচ্ছে মধ্যপথে সেই সমুদয় চিঠি গ্রাস করে ফেলেছে ও এক অভিনব উপায়ে। হাকিম সমন জারি করেছিলেন উত্তমর্ণদের। আয়কর আইনের ১৩১ ধারায়। নিজেই সামনস সার্ভ করবার দায়িত্বটাও গ্রহণ করে সমনের গতিপথ নির্ধারিত করে দিয়েছিল ও। তারপর বুধমল বাড়ির ড্রাইভার, ধোপা গা-মালিশের লোককে সিল্কের পাঞ্জাবী-টাঞ্জাবী পরিয়ে হাজির করিয়ে দিয়েছিল তৈরী খাতা-বাস্না দিয়ে। নতুন খাতা তৈরী করে চালের বস্তার মধ্যে, রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যে রেখে তাকে পুরোনো করেছিল। সবই ঠিক ঠিক হচ্ছিল, কিন্তু জবরদস্ত হাকিম উত্তমর্ণদের ক্রেডিটিবিলিটি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে পুরো দেড় লাখ টাকার জমা জুড়ে দিয়েছেন এ্যাসেসমেন্টে। তাই বুধমল আপীলের সময় শিবেনবাবুর শরণাপন্ন হয়েছে। এমনিতে বুধমল ও বুধমলের বাবা কাছ ঘেঁষে না শিবেনবাবুর—যখন একেবারে ঠেকে যায় তখনই আসে—সঙ্গে আচারের হাঁড়িটা, লাড্ডুর ঠোঙ্গা কি এক ঝুড়ি সফেদা নিয়ে আসে বড়বাজার থেকে কিনে—মুখে বলেঃ বুয়ার বাড়ি, কি শ্বশুরাল থেকে পাঠিয়েছে।

শিবেনবাবু গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপীলটা ভালো করে পড়লেন। পড়ে বললেন, কে ড্রাফট করেছে?

—হামিই করেছে। বুধমল বলল।

শিবেনবাবু স্থিরনেত্র হয়ে গেলেন।

বুধমল বলল, ঈ তো বহুতই ইজী আছে; বাঁধা গৎ।

That, on law as well as on the facts and in the circumstances of the case the learned I T O was wrong in........

—আর সোক্কোলের শেষে,

That other grounds may be taken at the time of hearing of the appeal.

তারপরই বুধমল বলল, গত বোছোরে সেই আমাদের রোহতাস-এর কোম্পানীর ব্যাপারে আপনি নগেন মুখার্জী স্যারের কাছে পাঠালেন না?—কী মেজাজ, কী ফীস, এক্কেবারে সত্যনাশ হয়ে গেলো। ফিরভি ওহি ভুল কোথ্‌আনো করি? উকিল বোলতে তো হামরা আপনাকেই জানি।

শিবেনবাবু বললেন, তা তো বুঝলাম, কিন্তু এ গ্রাউণ্ডস-এ তো চলবে না, অনেক ভুল-ভ্রান্তি আছে।

—হোয়াই দাদা? শেষকালে তো লিখেই দিয়েছি—আপনি এডিশোনাল গ্রাউণ্ডস লিয়ে লেন। যেমোন ভালো মোনে করেন।

শিবেনবাবু বললেন, এ্যাপিলেট এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কে?

বুধমল বলল, সেই-ই তো খাত্‌রা। আর বোলবেন না, এক নম্বরের হারামী আদমী আছে।

—সে কী?

—হ্যাঁ দাদা। শালা হাণ্ড্রেড পার্সেণ্ট অনেস্ট—ডরপোগ্‌ শালা। এক পয়সা রিলিফ দিতে হোলে ভাবে শালার বাবার টাকাই বুঝি ছাড়লো. এমোন হারামী আদমী না হলে কি হামি আপনার কাছে ছুটে আসি—হামার শালালোগ দিল্লীতে কারবার কোরে—সেখানে আদমী সব বহুত রীজন্‌-এবল আছে।

শিবেনবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তারপর বললেন, কী কী কাগজপত্র লাগবে সব লিখে দিচ্ছি, নিয়ে আসবে। ডিপোজিশনের কপি চাই ক্রেডিটরদের। তার জন্যে অ্যাপ্লাই করে দাও। তোমার অ্যাপীল কিন্তু পরশু হবে না।

—দাদা, পরশুহি করে লিন না। ওয়াইফ-কে লিয়ে একটু ফোরেন-এ যাচ্ছি আগামী সোপ্তাহে—এ ঝঞ্ঝাটটা মিটে গেলে সান্তিতে হলিডে এনজয়্‌ কোরতাম।

শিবেনবাবু বললেন, সব কাগজপত্র না পেলে, না দেখলে আমি তৈরী হবো কি করে? আমার মুখ দেখে কি রিলিফ দেবে?

—সে যা বোলেছেন। ভেরী রীজনএবল্‌ কোথা।

তারপর একটু থেমে বলল, খোঁজ লাগালাম বহত্‌ কিন্তু হারামীর কোনো হি ভাইস নেই। কোথা থেকে যে সোব গান্ধীজীর চেলা এসে দেশ ভোরে দিচ্ছে শালা ভোগোবানই জানে। এমোন হোলে সোব বেওসাদারের লাল বাত্তি জ্বালিয়ে যাবে।

শিবেনবাবু বললেন, ফরেন-এ যাচ্ছো কি এক্সপোর্ট ট্যুরে?

—এক্সপোর্ট করবো কি বোলেন দাদা? আলু তো রাখি কোল্ড স্টোরেজে, এক্সপোর্ট কী হোবে? না আলু, না স্টোরেজ প্ল্যান্ট! মাস তিন-চার হোলো অঙল্যাণ্ড, অমরিকা, ইরাপ সোব জাগামে খাত ভেজেছি ডি-হাইড্রেশান্‌ প্ল্যান্ট কারখানার কাছে। উসোব ফালতু—মগর বাহানা একটা চাই তো। আলু ডি-হাই-ড্রেট করে নিয়ে ফোরেন ভেজালে কেমন হোবে সেই বিষয়ে ডিসকাসন করতে যাচ্ছি। কাগজপত্র সোব ঠিকঠাক থাকবে ফাইলে।

তারপর একটু চিন্তা করে বলল, ফোরেন ট্রাভলিং-এর খরচ-টরচ সোব এ্যালাও হোবে তো?

—তোমার স্ত্রীও কি আলুর ডি-হাইড্রেশান নিয়ে ডিসকাস করবেন? শিবেন-বাবু হাসতে হাসতে শুধোলেন।

বুধমল বলল, সোবই তো বুঝেন। তারপর বলল, আপনি দাদা কী বোলেন? ওয়াইফ না থাকলে তো হামার নিজেরই ডি-হাইড্রেশান হোয়ে যাবে—আর আলুর ডি-হাইড্রেশান কি বোলছেন। সাচ্‌মুচ্‌ হামার ওয়াইফের ফাদার হামাকে একেলা

ছাড়লো না। হামি কি করতে পারি?

—কেন? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—আরে সে বড়ো শরমের কথা। আপনি তো ঘরের লোকই হচ্ছেন, আপনাকে বলছি দুসরা কাউকে বোলবেন না।

—কি?

—আমার সঙ্গে শ্বশুরমোশায়ের দিল্লীতে দেখা হয়ে গেলো বড়ো বেকায়দামে।

—কোথায়?

—রাণ্ডীকা ঘরমে।

তারপরই বুধমল বলল, ঠিক আছে। শালা শোসুরকেও সমঝাবো। আমিও আমার শাস্‌কে নিয়ে যেতে বলব যখন বুড়ুয়া ফোরেন ট্যুরে যাবে। বুঝবে তখন বুড়ুয়া। আমার শাসের ওজন আড়াই কুইন্টল—সারা দুনিয়া বয়ে বেড়াতে কেমোন মোজা, তখন শালা শোসুর বুঝবে। টিট্ ফর ট্যাট্ করেই দেবো সেই সোমায়।

—দু-জনে মিলে ফরেন যাওয়া, এতো ফরেন এক্সচেঞ্জ পাচ্ছো? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—গোভর্ণমেন্ট যা দিবে তাতে তো টয়লেট পেপারের খরচা ভি উঠবে না দাদা। উ সোব বন্দোবস্ত্ করতে হলো। এখানে দু নম্বরে দেড় লাখ রুপেয়া দিয়ে দিলাম ওখানে জ্যুরিখে আর প্যারিসে পেয়ে যাবো। মগর দেড় লাখ-এ ভি কিস্‌সু হোবে না। বড়ো মুসীব্বত্‌মে একমাস থাকতে হোবে।

শিবেনবাবু বললেন, যাই-ই হোক, তোমার এই অ্যাপীল পরশু করা যাবে না—এ্যাডজোর্নমেন্ট চাইতে হবে।

—শালাদের বড়ো বক্‌রমবাজী আজকাল—অ্যাডজোর্নমেন্ট দিতে ভি চায় না; তোবে আপনি বে-ফিক্কির রোহেন। লোটিস্‌টা হামাকে দিয়ে দেন, হামি ডেট করে লিয়ে আসবো।

—কি করে? শিবেনবাবু অবাক হলেন।

বুধমল হাসল। বলল, ফাইলসে একনোলেজমেন্ট সিলিপটা ফাড়িয়ে দেবো—নেহি তো ডেটটা কাটিয়ে দুসরা ডেট লিয়ে লেব অফিস্‌সেহি। উ শালা হারামী অফিসারের কাছে হামি যাবে না। কী না কি পুছ্‌বে।

শিবেনবাবু বললেন, ঠিক আছে, তোমার ব্যাপার তুমি বোঝো। পরের ডেটটা কবে হলো তা শুধু জানিয়ে যেও—আর শোনো, অ্যাপীলের ফী কিন্তু আমি গত মাস থেকে বাড়িয়ে দিয়েছি।

বুধমল বলল, আর দাদা হামার সোঙ্গে কি আপনার টাকা-পয়সা সোম্পর্ক? ভাবীজী মাড়োয়ারি খানা বহত্ পেয়ারসে খান। কোন্ রোজ আসবেন, ফোন করে দিবেন। ঘরমে বঁড়িয়া করকে কড়্‌হি ঔর ফুলকা ঔর আমরস ঔর সব্‌জী বানাবে।

শিবেনবাবু বললেন, ঠিক আছে।

বুধমল শিবেনবাবুকে আর একটা সিগারেট খাইয়ে চলে গেল। একটা কমপ্লিকেটেড ট্রাস্ট ডীড্ ড্রাফট করার ছিল। বুধমল চলে যেতে শিবেনবাবু বইপত্র পেড়ে ওটা নিয়ে পড়লেন।

বিকেলের দিকে ঝির-ঝির করে বৃষ্টি নামল। সারা আকাশ কালো করে এলো। তারপর মুষলধারে। কাজ করতে করতে শিবেনবাবু মুখ তুলে দেখে বুঝলেন যে, আজ আর এ বৃষ্টি থামবে তো নাই-ই—পথে জলও জমে যাবে হয়তো।

শিবেনবাবু সবিতাকে ফোন করলেন। সবিতার প্রাইভেট টিউটর ছিলেন শিবেনবাবু তাঁর যৌবনে। তখন শিবেনবাবুর চাল-চুলো ছিল না। একটা খুবই মিষ্টি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দু-জনের মধ্যে সেই সময়ে। কিন্তু বিয়ের কথা বলার সাহস হয়নি শিবেনবাবুর। সবিতাও প্র্যাকটিকাল মেয়ে ছিল—প্রেম করলেও কখনও শিবেনবাবুকে বিয়ে করতে চায়নি। তারপর সবিতার বিয়ে হয়েছিল সময়মতো এক বড়লোকের ছেলের সঙ্গে। তারপর অনেকানেক ঘটনার মধ্য দিয়ে সবিতার বিয়ের প্রায় দশ বছর পর শিবেনবাবু তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হন নতুন করে। সবিতার স্বামী বড় ব্যবসাদার। আজ এখানে কাল ওখানে ঘুরে বেড়ান—দিন-রাত টাকা টাকা করে। ছেলে-মেয়ে, ঘর-সংসার প্রাচুর্য সব কিছু থেকেও সবিতার মনে যে অসীম শূন্যতা সেই শূন্যতা শিবেনবাবু অনেকখানি পূরণ করেন।

সবিতা বলেন, শিবেনদা আমি যেন ফার্স্ট ইয়ারে পড়া সেই সবিতা হয়ে যাই মাঝে মাঝে—যদিও আমারই মেয়ে এবার পার্ট টু পরীক্ষা দিল। টেলিফোন ডায়াল করতে করতে, বাইরের বৃষ্টি দেখতে দেখতে শিবেনবাবুর মনটা বৃষ্টিভেজা সবুজ মাঠের মত নরম হয়ে এল।

এই তার এক নম্বর সত্তা। আনগার্ডেড, ওরিজিনাল; শিবেনবাবু।

শিবেনবাবু ভাবছিলেন যে, ভালোবাসার বোধহয় কোনো বয়স নেই। মানুষের মন বেঁচে থাকলেই ভালোবাসা জন্ম নেয়, প্রস্ফুটিত হয়, আবার শুকিয়ে যায় মরা ঘাসের মতো। মানুষের মন থাকলেই সে মন কখনও কখনও শূন্য হয়ে ওঠেই। প্রায়ই দেখা যায় যে, কোনো একজন পুরুষই কোনো একজন নারীকে বা কোনো একজন নারীই অন্য একজন পুরুষকে তাদের একে অন্যের শরীর মনের বহুমুখী চাওয়াকে পাওয়ায় পর্যবসিত করতে পারে না। ভাগ্যিস পারে না, পারলে জীবনটা কেমন অঙ্কের মতো হয়ে যেতো। তাতে পাওয়ার অসম্পূর্ণতা থাকতো না, চাওয়ার কান্না থাকতো না, ব্যথা থাকতো না, প্রাপ্তির আনন্দ থাকতো না, বঞ্চনার হাহাকারও থাকতো না।

শিবেনবাবু বললেন, ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে?

—হচ্ছে। সবিতা বললেন। তারপরই বললেন, বুঝেছি। আসা হবে বুঝি আজ? খিচুড়ি করবো?

—হুঁ। হাসতে হাসতে বললেন শিবেনবাবু।

—কখন আসবে? সবিতা শুধালেন।

—এই সাতটটা-আটটা নাগাদ।

—ও থাকবে কিন্তু। সবিতা সাবধান করে দিলেন শিবেনবাবুকে।

—থাকুক না। ও কি বাঘ? ও-ও তো আমার মতো খিচুড়ি ভক্ত।

সবিতা হাসলেন। বললেন, শুধু খিচুড়ি কেন আরও অনেক কিছুর ভক্ত। ঠিক আছে এসো।

সবিতার প্রতি শরীরের কোনো টান আজকাল বোধ করেন না শিবেনবাবু। যতই বয়স বাড়ছে বুঝতে পারছেন যে যৌবনে যেটাকে ভালোবাসা বলে ভাবতেন সেটা বোধ হয় ভালোবাসা নয়। সবিতার কাছে একটু বসে থাকা, ওর বড় বড়

ছেলে মেয়ে, ওর স্বামী, ওর চাকর-বাকর সকলের মধ্যেই সবিতার যে আসন সেই আসনে তাকে আসীন দেখেও, তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তার সঙ্গে একটু কথা বলেও যা আনন্দ!

প্রৌঢ়ত্বের এই শান্ত মিষ্টি সুখের মধ্যে শরীরকে এনে তা মাটি করতে চাননি।

সেদিন মাধবীলতা এই সবিতার কথাই ইঙ্গিতে বলেছিলেন। সবিতাই শিবেনবাবুর দু নম্বর। মাধবীর মতে। কিন্তু শিবেনবাবু খুশী হতেন যদি সবিতাই এক নম্বর হতেন।

ফোনটা নামিয়ে রেখে শিবেনবাবু ভাবলেন, এক নম্বরটা সত্যি; ভাস্বর। সকলের দৃষ্টিগোচর—তাই-ই বুঝি প্রকাশ্য। আর দু নম্বর মানেই গোপন। প্রেম, টাকা; সব কিছু। হাশ্-হাশ্, চুপ চুপ ব্যাপার।

কাজ শেষ করে যখন উঠলেন, তখন ছ-টা। ভাবলেন, আজ তাড়াতাড়ি গিয়ে সবিতাকে চমকে দেবেন। হয়তো ও গা ধুতে যায়নি এখনও অথবা এখুনি গা-ধুয়ে বেরুলো—গা-ধোবার পরে সবিতাকে বড় সুন্দর দেখেন শিবেনবাবু। হয়তো সব মানুষই সব মানুষকে দেখে, ভালোবাসার জনকে। তাছাড়া, মদনবাবু এতো তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ করে আসেন না। সেটাও একটা উপরি লাভ। যতটুকু একা পাওয়া যায় সবিতাকে। সবিতার মেয়ে কবিতা দেখতে ভারী সুন্দরী—গানের গলাও ভালো। আধুনিক গান গায়। ওর বয়-ফ্রেন্ডদের টেলি-ফোনের জন্যে টেলিফোন প্রায় সারাক্ষণই এনগেজড থাকে ইদানীং; যখন ঠিক থাকেও ফোন, তরুণী মেয়ের তরুণ অ্যাডমায়ারারদের কলকাকলিতে সবিতার এক-মাত্র প্রেমিকের পক্ষেও ফোনে তাকে একটুর জন্যেও পাওয়া মুশকিল হয়ে ওঠে।

মনে মনে ক্ষমার হাসি হাসেন শিবেনবাবু, কবিতার মুখটা মনে পড়ে। বলেন, তোরা সবাই সুখী হোস মা। সকলে সুখী হোস। সুখী থাকিস।

রাম অবতার এখনও ভালো হয়নি। তার বস্তির একজন লোক এসে খবর দিয়েছিল যে, বেমারী ভারী, বুকমে দরদ। শিবেনবাবু পঁচিশটা টাকা তাকে দিয়ে বলেছিলেন যে ভালো করে ইলাজ করাও। রাম অবতার টাকা চেয়ে পাঠায়নি। লোকটা ভালো। পেট্রল চুরি করে না, রিপেয়ারের গ্যারেজের সঙ্গে সাঁট নেই। কখনও মুখ ফুটে কিছু চায়নি, এই পনেরো বছরে শিবেনবাবুর কাছে। পনেরো বছর আগে যা মাইনে ছিল এখনও তাই-ই আছে। শিবেনবাবু বোঝেন যে, অসুবিধা হয় ওর, জিনিসপত্রের দাম পনেরো বছরে বহু গুণ বেড়ে গেছে—সুখা দুশো টাকায় কলকাতায় একজন লোকের আজকাল বেঁচে থাকাই মুশকিল, তার উপর দেহাতে স্ত্রী-পরিবার আছে। কিন্তু যেহেতু রাম অবতার চায়নি নিজে, উনিও মাইনে বাড়াননি।

এদেশে কলার চেপে না ধরলে কেউ কাউকে কিছু দেয় না। বিবেক-ফিবেক সব যাত্রাদলের চরিত্র হয়ে গেছে। শিবেনবাবুর অনেক মক্কেল আছেন, যাঁরা পনেরো বছর আগেও যা ফীস দিতেন, আজও তাই-ই দেন। ও নিজে যেখানে যেখানে বলেছে সেখানে সেখানে দরদস্তুর করে ওঁরা কিছুটা বাড়িয়েছেন। কিন্তু না চাইতেই ন্যায্য বিবেচনা করে তাঁকে বেশী টাকা দিয়েছেন এমন মক্কেলও ওঁর আছে কিছু কিছু।

ভাগ্যের কথা। তাঁদের মধ্যে একজন ভূতিবাবু। সেদিন ফোন করে হেসে বলেছিলেন, হাঃ হঃ ভায়া, বেগুনের দর পাঁচ বছর আগে যা ছিল এখনও কি তা আছে? এমন ভালোমানুষী করলে যে ঠকবেই শুধু। তোমাকে এবারে হাজার

টাকা পাঠিয়ে দিলাম। ভূতিবাবু পাঁচ বছর অন্তর নিজেই অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে ফী। উনি বলেন যে, ভগবান ওঁকে অনেক দিয়েছেন এবং উনিও অনেক দিয়েছে সকলকে। যাঁরা সকলকে দেন, সকলের জন্যে নিজে থেকে করেন ভগবান তাঁদে আরো বেশী করে ভরে দেন।

কিন্তু শিবেনবাবু নিজে এই এক্সপেরিমেন্ট এ পর্যন্ত সাহস করে করতে পারেননি। যা না-দিলেই নয়, তার বেশী কাউকেই দিতে পারেননি—একটুও না চাইলেও নয়। হয়তো এ জন্মে পারবেনও না। ভূতিবাবু প্রচারিত এই অমিত ব্যয়িতার মধ্যে তিনি চিরদিনই এক মূর্খামির গন্ধ পেয়েছেন। ভগবান বলে কিছু কি আছে? মনে হয় না তো তাঁর। মনে হওয়াটা স্টুপিডিটির লক্ষণ। উনি ছোটবেলায় সায়েবদের বলতে শুনেছিলেন। Waste not, want not. উনি একথা বিশ্বাস করেন। ভলান্টিয়ারী করে পরোপকার করার মত গাধা তিনি নন

চিত্তরঞ্জন এ্যাভিন্যুতে গাড়ি পড়তেই হেডলাইটের আলোয় দেখলেন বিজিতেনদা দাঁড়িয়ে আছেন হাতে ছাতা নিয়ে—কিন্তু তবুও সারা গা ভিজে চুপ-চুপ করছে।

শিবেনবাবু যদিও সবিতার কাছে যাবেন, তবুও গাড়িটা রাখলেন।

বিজিতেনদা মানুষ খুব ভালো। বহু পুরানো লোক। শিবেনবাবু প্র্যাকটিস শুরু করার সময় থেকেই দেখছেন ওঁকে। ওঁদের মধ্যে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল অনেক সাহায্য করেছেন বিজিতেনদা শিবেনবাবুর পসারহীন দিনে। বহু মক্কেল পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে প্রথম প্রথম।

বিজিতেনদা শিবেনবাবুকে দেখতে পেয়েই বললেন, বাঁচাইলা শিবু। ভাবতা ছিলাম আইজ বাড়ি যামু কেমনে?

—এতক্ষণ অফিস? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—অফিস? ও হোঃ শোনো নাই বুঝি তুমি? আমি পরশু রিটায়ার কইর‍্যা মুক্ত। এক্কেরে হকল ঝামেলা থিক্যা মুক্ত। যারে কয় মুক্তপুরুষ।

—সে কী? রিটায়ার করেছেন শুনিনি তো, শিবেনবাবু বললেন।

—হাঃ, আমি কেডা এমন কেউকেটা যা পৃথিবীশুদ্ধা লোকের জানন লাগবো

—বড় ছেলে কি করে? ছেলেরা দাঁড়িয়ে গেছে দাদা? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—হ। দাঁড়াইয়াই তো থাকে হক্কল সময় রাস্তার মোড়ে। বড়ডা পার্ট টুতে দুইবার গাড্ডা মারছে। ছোটডা ক্লাস নাইন। দুই ভাই সমান। বাপের মতোই ব্রিলিয়ান্ট হইছে আর কি! অগো আর দুষ্যা লাভ কি?

—আর মেয়ে?

—মাইয়াডারে বিয়া দিছি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা উঠাইয়া। দুই বচ্ছর হইয়া গেল।

—জামাই কি করে?

—সেইডায় আছে এ-জি বেঙ্গলে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। পোলাডা ভালো। পান ছাড়া নেশা নাই। আমার মাইয়াডার বড়ই বাধ্য।

—প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর সেভিংস-টেভিংস মিলিয়ে আছে কত? চালাবেন কি করে? শিবেনবাবু প্রশ্ন করলেন। যেন না চললে উনিই চালিয়ে দেবেন।

—টাহা আছে। আছে অনেক। সবডা লইয়া পাঁচ হাজার। ফিকসড ডিপোজিটে থুইলে বছরে তিনশো টাকা আইতো—মাসে কত? কও দ্যাহি?

তারপরই হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন, তিনশো ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ। পঁচিশ।

—তবে? শিবেনবাবু চিন্তান্বিত গলায় বললেন।

—তবে? আর কি? আমাগো ডাকাবাবুকে চেনো তো—। হরেনবাবুর জুনিয়র। তার সেরেস্তায় একটা কাম লইছি। সকাল নয়টা হইতে বিকাল ছয়টা অবধি ডিউটি। রিটার্ণ-টিটার্ণ ফিল-আপ কইর‍্যা দেই—চিঠিপত্র ড্রাফট করি—মাহিয়ানা দুই শত। মাসে। ডাকাবাবুর ইংরাজিটা বিশেষ উইক। আমাগো মতন ইংরেজি জানে কয়ডা লোকে? আমরা হইলাম গিয়া হেই যুগের বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র।

শিবেনবাবু আর বেশী উৎসাহ দেখালেন না, পাছে বিজিতেনদাকে চাকরি দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে পড়ে।

বললেন, তা তো ঠিকই। আপনার মতো ইংরিজী, তাছাড়া ট্যাক্স ক্যালকুলেশান ক'জন জানে?

বিজিতেনদা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। ওয়াইপার ব্লেডটা সড়াক-সড়াক করে জল কাটছিলো। রাস্তায় খুব জ্যাম। বিজিতেনদা নস্যির কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নিলেন।

শিবেনবাবু বললেন, বৌদি কেমন আছেন? বৌদি এখনও জর্দা খাচ্ছেন? তাহলে তো পানের কারণে শাশুড়ী জামাইতে খুব ভাব, কি বলেন?

নাকটা একটা নস্যিমাখা নোংরা রুমালে ঝেড়ে নিয়ে বিজিতেনদা বললেন, তা আছে।

তারপরই গম্ভীর মুখে বললেন, তোমার বৌদি একটা বিপদ বাধাইয়া বইস্যা আছে। এহন এই পেনসনের টাহা আর ডাকাবাবুর দয়া ভরসা। বড়ই চিন্তায় আছি শিবু, বোঝলা?

শিবেনবাবু বললেন, কি হয়েছে বৌদির।

—ইউটেরাসে ক্যান্সার।

—সর্বনাশ! বলেন কি? বৌদির?

—আর বলনের আছে কি কও? টাহা পয়সা না থাকলে বোঝ না, বুড়া বয়সে ছাওয়াল মাইয়াগুলাও চাইয়া দেহে না। মাইয়াডা তাও ভালো! বাবা-বাবা মা-মা করে। যহনই আসে হাতে কইর‍্যা কলাডা মুলাডা লইয়া আসে। কিন্তু অগো সামর্থ্য তো নাই। দিনকালটা কী পড়ছে? আইজকাল টাহা ছাড়া ভালোবাসার দামটা কি কও? অগো নিজেদেরই কোনোক্রমে চল্‌তা আছে, আমাগো লাইগ্যা করনের উপায় নাই কোনো অগো।

শিবেনবাবু হঠাৎ মহানুভব হয়ে বললেন, আমি কি করতে পারি বিজিতেনদা? আপনার জন্যে এই বিপদে?

বিজিতেনদা শিবেনবাবুর মুখের দিকে চাইলেন। উল্টোদিকের গাড়ির হেড-লাইট এসে পড়লো বিজিতেনদার মুখে। শিবেনবাবু দেখলেন বড় করুণ দেখাচ্ছে ওঁর মুখটা। বড় কষ্ট ওঁর। জাগতিক কষ্টের গভীর নিষ্ঠুর ছাপ ওঁর মুখে। কিন্তু হঠাৎ বিজিতেনবাবু দেবদূতের মতো হাসলেন। তাঁর সমস্ত ক্লিষ্ট মুখ এক জ্যোতিতে ভরে গেল যেন।

বললেন, নাথিং ব্রাদার, নাথিং। আমার দায়িত্ব আমারেই বইতে হইব। কিছুই করনের নাই তোমার। তবে......।

শিবেনবাবু বললেন, তবে কি বলুন?

—তবে, বড় ছাওয়ালডার একটা চাকরী দেইখ্যা দিতে যদি পারো তবে এট্টা উপগারের মতো উপগার হয়। যে-কোনো চাকরী। মার্কেনটাইল ফার্মে, ক্লার্ক, স্টোর কিপার...যে-কোনো...।

শিবেনবাবু বললেন, একটা কথা বলবো, কিছু মনে করবেন না—ওকে ড্রাইভারী শেখান না। ড্রাইভার হলে আজকাল খুব ভালো মাইনে। ড্রাইভিং শিখতে যা টাকা লাগে আমি দেবো—ও চাকরী পেয়ে ধীরে ধীরে শোধ করে দেবে না হয়।

বিজিতেনবাবুর মুখ হঠাৎ কালো হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে টেনে টেনে বললেন, শিবু, এইডা তুমি কি কইলা? বিজিতেন স্যানের পোলায় ড্রাইভার হইব। না, না, হে হয় না। তার চাইয়া অর না খাইয়া মরণ ঢের ভালো।

শিবেনবাবু বললেন, দাদা, কিছু মনে করবেন না। আপনি চিরদিনই একটু অন্যরকম।

—হ তা ঠিকই কইছ।

তারপর একটু ভেবে স্বগতোক্তির মতো বললেন, রিটায়ার করনের দুইদিন আগে আমার এক ক্লোজ কলিগ আমারে কইতে আছিল—বিজিতেন তুই একটা ছাগল। দিনকালডা যা পড়ছে এটু নিজের থনে দ্যাখ। তুই রিটায়ার কইর‍্যা আংগুল চুষিস্‌খন। বৌ-পোলারে খাওয়াইবা কি হারামজাদা?

—বোঝলা শিবেন, আমি তনে হাসতাছিলাম। ওর কথা শুইন্যা।

শিবেনবাবু বললেন, আপনি কি উত্তর দিলেন?

আমি অরে কইল্যাম, ক্যান? লক্ষ লক্ষ লোকের যা দুর্দশা, আমারও তাই অইব। আমার প্রিন্সিপ্যাল থিক্যা আমি এক পা হটুম না। আমি জানি শিবেন, এই বাজারে অনেকে অনেক কিছু করতাছে। না কইর‍্যাই বা করে কি? লোকে না খাইয়া থাইক্যা তো আর অনেস্টি বাইট্যা-ধুইয়া খাইয়া বাঁইচব না। আমি অগো দুষ দেই না। অগো প্রেডিকামেন্ট আমি রিয়্যালাইজ করি, করি; কিন্তু আমার দ্বারা অইল না। অয় নাই; অইব না।

শিবেনবাবু বললেন, সে-কথা আর বলতে দাদা। আপনাকে কে না জানে?

বিজিতেনবাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বোঝলা শিবু, ওসব কিছু না। আসল হইতাছে পস্‌টারিটি। পস্‌টারিটির কী অইব? আমি ডিস্‌অনেস্ট হইলে আমার পোলায় ডিস্‌অনেস্ট অইব না? আমি মদ গিললে, আমার পোলায় মদ গিলব না? এইডা সুখে থাহন আর দুঃখে থাহনের ব্যাপার নারে ভাই—এইডা ন্যাশনাল ক্যারেকটারের কোশ্চেন্—জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

শিবেনবাবু কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, মল্লিক সাহেব তো আপনারই সমবয়সী। উনিও রিটায়ার করছেন নাকি?

—আরে নাঃ। বিজিতেনদা বললেন, ওর ম্যাট্রিক সার্টিফিকেটে চার বছর বয়স কম আছে। ওর রিটায়ার করনের দেরী আছে।

—আর আপনার?

—আমার? আর কও ক্যান? ঠাকুর্দায় ছয়মাস বাড়াইয়া থুইছিল ইস্কুলে, ছয়মাস আগেই রিটায়ার হইলাম হেই কারণে।

শিবেনবাবু চুপ করে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সবিতার বাড়ির কাছাকাছি এসে গেলেন প্রায়। রিটায়ার করেছেন জানলে শিবেনবাবু আগে বিজিতেনবাবুকে

গাড়িতে ওঠাতেনই না। একে খাতির করে লাভ কি এখন? ডেড হর্স্!

বললেন, কোন্ দিকে যাবেন দাদা?

বিজিতেনবাবু চমকে উঠে বললেন, ক্যান? বাড়ি? তুমি তো কতবার লামাইয়া দিছ আমারে? ভুইল্যা গেলা নাকি?

শিবেনবাবু বললেন, না, বাড়িটা ভুলিনি, কিন্তু আমি যে একটু অন্যদিকে যাবো।

—অ। তাই বুঝি? একটু অপ্রস্তুত হলেন বিজিতেনবাবু।

তারপর বললেন, এট্টু আগে যদি কইতা তা বিডন স্ট্রীটের মোড় থিক্যা বাস পাইতাম। রাস্তায় দেহি জলও জইম্যা গেছে—ছাতাখানও ছেঁড়া। ঠিক আছে. তুমি যখন অন্যত্র যাইবা—যাও। আমারে বাঁয়ে লামাইয়া দিয়া যাও।

শিবেনবাবুর বিবেক নামক ব্যাপারটি একটু নড়াচড়া করে উঠতেই তিনি থাপ্পড় মেরে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। গাড়িটা আস্তে করে দাঁড় করালেন।

রাস্তায় অল্প অল্প জল জমেছে। দরজা খুলে নামতে গিয়ে ছাতা-সুদ্ধ ঝপাং করে জলে পড়লেন বয়স্ক বিজিতেনবাবু। ভদ্রলোকের বোধহয় বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড় বদলাতে অনেক দেরী হবে. ভিজে গিয়ে জ্বর-জারিতেও পড়বেন। কিন্তু এ-সংসারে অন্যের সুবিধা দেখতে গেলে নিজের বড়ই অসুবিধা।

—চললাম দাদা, বলেই শিবেনবাবু গাড়ি ঘোরালেন ডানদিকে।

চলতে চলতে শিবেনবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল, বুধমলের বাবা একবার শিবেন-বাবুকে বলেছিল, সমঝে কি না ব্যানার্জী সাহাব, এহি যে আমাদের বিবেক—এ শালা বোড়ো হারামজাদা আছে। জীবনে আগে বাড়তে গেলেই হরওয়াক্ত্ এ শালা এসে হামলা করবে—বে-মতলব যত্তোসব ঝুট-ঝামেলা পয়দা করবে। এ শালা লটর-পটর করলে সাথ্থেসাথ্থি একে জোরসে দাবিয়ে দিবেন। চেপে দিবেন।

শিবেনবাবু এ্যাকসিলারেটরে চাপ দিলেন—জোরে ছোটালেন তাঁর গাড়ি গন্তব্যের দিকে।

সন্ধ্যের পর চেম্বারে হঠাৎ গদাই এসে হাজির। ফোনে কিছু বলেনি। উস্কো-খুস্কো চুল, ময়লা পাঞ্জাবী পরা, মনে হয় রাতে ঘুম হয়নি।

শিবেনবাবু বললেন, কি গদাই? কোনো নতুন জমির খোঁজ পেলে?

গদাই থপ্ করে বসে পড়ে বলল, জমির খোঁজ নিয়ে আসিনি ভাই, আমার বড় বিপদ।

—কি হলো?

গদাই বলল, এক গ্লাস জল খাবো।

রঘু জল এনে দিলো। জল খেয়ে গদাই বলল, তোমাকে সব বলতে হবে, না বললে বাঁচবো না। তুমি একটা উপায় করো ভাই।

—কি, হলোটা কি?

—আমার জেল হয়ে যাবে শিবেন। বউ ছেলে-মেয়ে এমনিতেই আধপেটা খেয়ে আছে, তাহলে একেবারে না খেয়ে মরবে। বড় মেয়েটার বয়স আঠারো হলো, মেজটার ষোল, ছেলেটার সাত। তুমি না বাঁচালে, মেয়ে দুটো আমার নষ্ট হয়ে যাবে। ছেলেটা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না।

শিবেনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, আহা! কি হয়েছে তাই বলো না?

—এখানে নয়। তুমি হোটেলে চলো। আমি হোটেলে আছি কাল থেকে। আমার ফিনান্সিয়ার রেখেছে—কারণ আমি ধরা পড়লে সে-ও বাঁচবে না।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। শিবেনবাবু বললেন।

গদাই হাত ধরে বলল, তোমার কোনো বিপদ নেই ভাই, সত্যি কথা বলছি। তুমি কথা না বলে আমার সঙ্গে চলো। তোমার নাম পর্যন্ত বলিনি আমার ফিনান্-সিয়ারকে। কিন্তু সে তোমাকে মিট করতে চায়। তোমার সম্বন্ধীকে ধরে এ-যাত্রা আমাদের উদ্ধার করো—।

শিবেনবাবুর চোয়াল শক্ত হয়ে এলো। বললেন, আমার সম্বন্ধী এখন আর পাওয়ারে নেই। তাছাড়া আমার আপন সম্বন্ধী তো নয়। তাছাড়া একেবারে সামনে ইলেকশান। পুরো ব্যাপারটা ফ্লুইড্ স্টেটে আছে।

তা-হোক্।—এই ট্রানজিটরী পিরিয়ডে আরও সুবিধা। কানেকশানস্ তো ওঁর আছে। উনি আড়ালে থেকে সব করতে পারবেন। সব লেভেলে জানাশোনা আছে—তাহলেই কাজ হয়ে যাবে। পুলিশকে একটু বলে দিতে হবে। গদাই বলল।

শিবেনবাবু কি করবেন বুঝতে পারলেন না। গদাই নাছোড়বান্দা। গদাই-এর সঙ্গে বেরোলেন তিনি।

গদাই গাড়িতে উঠে বলল, তোমার কানেকশানস্ খুব ভালো। কত বড় বড় ক্লায়েন্ট-টায়েন্ট আছে—তুমিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। তুমি না পারলে কেউই পারবে না।

গদাই চৌরঙ্গীর একটি ফাইভ-স্টার হোটেলের দোতলার একটি ঘরে নিয়ে গেল শিবেনবাবুকে।

দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। ঘরে ঢুকতেই শিবেনবাবু দেখলেন

যে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে লেপার্ড কাউর বসে আছে। আর খাটের ওপর কুসি। আধশোয়া ভঙ্গীতে। বিছানার চাদর-বালিশ এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

—কী ব্যাপার? শিবেনবাবু চমকে উঠলেন।

লেপার্ড চমকে উঠে বলল, আপ?

তারপর গদাইয়ের দিকে ফিরে বলল, গদাই আই নো মিস্টার ব্যানার্জী ওয়েল। বলেই বলল, ব্যানার্জী সাব মুঝকো বাঁচাইয়ে—আই অ্যাম রেডি টু স্পেণ্ড এনি অ্যামাউন্ট। পয়সেসে নেই হোনেসে—শী ইজ হিয়ার। ইউ মে ইউজ হার।

শিবেনবাবু রেগে উঠে বললেন, হাউ ডেয়ার উ্য। বলেই, দরজা খুলে চলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় গদাই সাষ্টাঙ্গে ও'র পায়ে পড়ল। শিবেনবাবু বুধমল-এর ভাষায় রীজন্‌এবল হলেন। ঘুরে দাঁড়ালেন।

লেপার্ড সব গুছিয়ে বলল, ওরা বিলিতী মদ, হাশিস, সেক্স-এইডস্ ইত্যাদির স্মাগলিং করত। এটা ওর সাইড বিজনেস্—। ওর ওয়াইফের শপিং-এর খরচা ওঠাবার জন্যে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু তার পর লোভ গেলে বেড়ে। বিলিতী মদ জাল করতে শুরু করল গদাই-এর সহায়তায়। প্রচণ্ড প্রফিট। নানারকম প্রক্রিয়ায় মুখ খুলে, জাল মুখ পরানো কাঁচের শিশিতে ইনজেকট করে খাঁটি মাল বের করে বাজে মাল ভরে দেওয়া। ধরার উপায় নেই। এদেশে যারা নেশা করে, তাদের সাহেবদের দেশের লেবেল দেখেই নেশা হয়ে যায়। রেডি-মার্কেট। সপ্তাহে সপ্তাহে বিশ-পঞ্চাশ কেস্ আরামে বিক্রি হতো। কিন্তু গতকাল রাতে এক এ্যাডভার্টাইজিং ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেকটর নন্দী সাহেব এই মাল খেয়ে মারা যান। কুসিই বব নন্দীকে ইনট্রোডিউস্ করে দিয়েছিল গদাইয়ের সঙ্গে। কুসির উপরের মহলে জানাশোনা শোয়াবসা আছে, তাই ওর পক্ষে এই মাল চালানো সোজা ছিল। ভালো কমিশন পেতো কুসি। কুসির আসল প্রফেশানের ওপরে এই কমিশন বাড়তি রোজগার ছিল; কিন্তু বব নন্দী এই মাল খেয়ে মরে গিয়েই সর্বনাশ করল। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে ও'দের। ধরা পড়লে নির্ঘাৎ জেল। কারখানা পুলিশের হেপাজতে। লেপার্ড বলল, জেলটাও বড় কথা নয় ব্যানার্জী সাহেব, কনসিডার মাই সোশ্যাল স্ট্যাটাস। হাই সোসাইটিতে আমাকে কি চোখে লোকে দেখে আপনি জানেন। সব শালারই কিছু না কিছু দু-নম্বরী কারবার আছে, থাকে। দু-নম্বরী ধান্দা না করলে কি আজকাল চলে? এই যে শালা রইস মালহোত্রা, ও শালা ব্রথেল্‌কীপার।

গদাই বলল, সব শালাই করে, কিন্তু চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়েন ধরা!

লেপার্ড বলল, রাস্তা আর নেই। যেমন করে হোক ব্যাপারটা ধামা-চাপা দিতেই হবে। যে লেভেলে এখন চলে গেছে তা পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স্ ছাড়া ধামা-চাপা দেওয়া যাবে না। যে-কোনো পার্টি ফাণ্ডে যত টাকা চাই দেবো। কুসিকেও দেবো। দরকার হলে মালহোত্রাকে বলে কুসির চেয়ে আরও ভালো ভালো ইয়াংগার ছোক্‌রিকাভি ইন্তেজাম করব। বাট উ্য মাস্ট ডু ইট।

কথাটা শুনে কুসির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

শিবেনবাবু বললেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে দিল্লীর এতো জানাশোনা, আপনি পরিমলবাবুকে বলে মিটিয়ে নিন না। শুনেছি আপনার সঙ্গে পরিমলবাবুর খুব দহরম-মহরম।

দিল্লী নিয়ে আপনি ভাববেন না। আপনি স্টেট লেভেলটা সামলিয়ে দিন।

গদাই লেপার্ডকে বলল, কিন্তু ব্যানার্জী সাহেব যে এত করবেন, উনি কি পারেন? এসব ত ও'র কাজ নয়। উনি রেসপেকটেবল লোক।

লেপার্ড বলল, তা আমি জানি। কিন্তু আজকাল একটা প্রফেশান করে কারোই পেট ভরে না।

তারপর শিবেনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, যা চান—মানি—এনি অ্যামাউন্ট্ আই টোল্ড উ্য। ফাইভ, টেন, ফিফ্‌টিন। বাট নট মোর দ্যান ফিফ্‌টিন। এই হাশিং-আপ প্রজেকটে আমার কস্ট এস্টিমেট হচ্ছে পোণ্ঠাশ হাজার। সীড্ ক্যাপিটাল আসল লোককে দিয়ে দিন পঁচিশ। ফিফ্‌টিন আপনার। ব্যালান্স ইন্‌সিডেন্টাল এক্সপেন্‌সেস। কেয়া? ডীল?

শিবেনবাবুর মাথা ভোঁ-ভোঁ করছিল। পনেরো হাজার দু-নম্বরে! মিনুর বিয়ে হেসে খেলে হয়ে যাবে। নিউ আলিপুরের জমিটাও হতে পারে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধী কি তাঁর কথা শুনবেন? অবশ্য মুখের কথায় আজকাল চিঁড়ে ভেজে না। পঁচিশ হাজার টাকাও তো! কি করবেন? ছিঃ ছিঃ, এমন একটা অন্যায় কাজ! টাকা—পনেরো হাজার!

শিবেনবাবু শিবনেত্র হয়ে ভাবতে লাগলেন। "টাকার মতো আঠা আর নেই স্যার। এ দুনিয়ায় সব ছ্যাঁদাই এতে বুজে যায়।"

শিবেনবাবু বসলেন, ভাবলেন; বললেন, জল। জল খাবো।

কুসি হোটেলের ফ্লাস্ক থেকে ঠান্ডা জল ঢেলে এনে দিলো। মেয়েটা দেখতে বেশ। টাকা। পনেরো হাজার। মিনুর বিয়ে। জি-ব্লক। নিউ আলিপুর। ফোক্‌টাই। টাকা। পনেরো হাজার!

গদাই লেপার্ডকে বলল, স্যার মিস্টার ব্যানার্জীর এ্যামাউন্টটা কম হয়ে যাচ্ছে।

লেপার্ড তীক্ষ্ন চোখে চাইল। লেপার্ড ট্র্যাপে পড়েছে। হাঁকোয়া শিকারে একদল হাঁকাওয়ালা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। কোথায়? শিবেন ব্যানার্জীর মাচার তলায়। উইন্ডফল। এজ লাক উড হ্যাভ ইট্। শুট স্ট্রেইট। সফ্‌ট নোজ।

লেপার্ড বলল, পাঁচ বাড়িয়ে নিন।

গদাই বলল, স্যার ওটাকে দশ করুন। টুয়েন্টিফাইভ।

—ও-কে। ডীল! লেপার্ড বলল, বাট মুভ কুইক। কুইকার দ্যান দা অপোনেন্ট। পুলিশ। সি-বি-আই। এনফোর্সমেন্ট। মুভ কুইকার দ্যান আ লেপার্ড।

শিবেনবাবু ভাবলেন, এখানে থাকা আন্‌সেফ। পুলিশ যদি এখানে চলে আসে তো উনিও জড়িয়ে পড়বেন। এমন একটা স্ক্যান্ডাল্। সবিতার মুখটা মনে পড়ল। মেয়ে পিয়ার মুখ। মাধবীলতার মুখ। সম্বন্ধীর মুখটাও মনে পড়ল। শালা ছোটলোক। ইলেকশানের টিকিট দিলো না। কিন্তু যাই-ই হোক, এ কাজটা করে দিতে পারলে শালার দৌলতেই মিনুর বিয়েটা। জি-ব্লক। নিউ আলিপুর। ফোক্‌টাই।

গদাই বলল, আমরা উঠি।

বলে, গদাই-ই শিবেনবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলো। এসে বলল, পঁচিশের পাঁচ কিন্তু আমার। এ-শালার হাত দিয়ে জল গলে না। হাতে হারিকেন হয়েছে বলে এখন অন্য রূপ। তোমাকে এত বড় একটা প্রাপ্তিযোগ ঘটিয়ে দিলুম। পাঁচ।

শিবেনবাবু কথা বললেন না। কুড়ি। ও-কে। আই অ্যাম গেম।

সম্বন্ধী খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী পরে বসার ঘরে বসেছিলেন। দেওয়ালে মালা-গলায় দন্তবিকশিত ছবি তাঁর। তিনি ভগ্নীপতিকে বিশেষ পছন্দ করেন না। তাঁকে তেল না দিয়েই ভগ্নীপতি নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন ও প্রভাব-প্রতিপত্তিতে তাঁর প্রায় সমকক্ষ হয়ে উঠেছেন. এ-ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভালো লাগেনি।

একটা খোঁচা মারলেন উনি। শিবেনবাবুকে বললেন, এসব কারবারে কবে নেমেছো? মাধবী কি জানে?

শিবেনবাবু বললেন, আমি? না. না, আমি নই। এদের বিপদ বলে।

সম্বন্ধী বললেন. সব ব্যাটাই ওই কথা বলে।

তারপর গদাই-এর কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন, নাকে চশমা এ'টে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে একটা প্যাডে কী সব লিখলেন।

শিবেনবাবুর মনে হল সম্বন্ধীর আদবকায়দা. পেন্সিল নাড়ানোর বাহার এমনই যেন উনি সুপ্রীম কোর্টের এ্যাডভোকেট।

সব শুনে সম্বন্ধী বললেন. আই সী। ইটস্ আ ভেরী কম্প্লিকেটেড ম্যাটার।

গদাই বলল, কাজটা হবে তো স্যার?

সম্বন্ধী বললেন. এখানে এসে কেউ বিফলে ফিরে যায় না। তবে খরচা-পত্তর আছে। দেশসেবাই আমার একমাত্র কাজ। অন্য কোনো প্রফেশান নেই—তাই বুঝতেই পারছেন। তাছাড়া. সারা দেশের পোলিটিক্যাল আবহাওয়া এখন সাইক্লোনিক।

—কী করতে হবে বলুন স্যার?

স্যার বললেন. শিবেন আমার আপন মাসতুতো ভগ্নীপোত। আমার আপন বোনও নেই। ও নিয়ে এয়েছে আপনাদের. স্পেশ্যাল কেস। দশ রেখে যান অন্-অ্যাকাউন্টে। ফোন পেলে বাকি দিয়ে যাবেন। কাজ হয়ে যাবে।

—বাকী থাকবে কত স্যার?

সাধু-সন্তদের মত নির্মল হাসি হাসলেন সম্বন্ধী, বললেন, কষ্ট না করে কত দিতে পারেন?

—আরও দশ। মাছের বাজারের মত দর লাগালো গদাই।

সম্বন্ধী কুং-কুং করে হাসলেন। বললেন. আপনার কোনো আইডিয়া নেই পোলিটিক্যাল পাওয়ারের দামের। দশ রেখে যান. পরে কুড়ি দেবেন।

গদাই লাফিয়ে উঠে সম্বন্ধীর পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। বলল, মরে যাব স্যার। ওটাকে দশ করুন। টোটাল কুড়ি। বিশ। বিষ।

সম্বন্ধী কি ভাবলেন। তারপর বললেন. ঠিক আছে। শিবেনের খাতিরে। কিন্তু দশ এক্ষুনি চাই।

গদাই বলল, আনিনি সঙ্গে। নিয়ে আসছি।

সম্বন্ধী বিরক্ত হলেন। বললেন. খালি হাতে কি এখানে ছেলেখেলা করতে এয়েচেন? যান।. শিবেনের জন্যে কিছু বললাম না।

গদাই শিবেনবাবুকে বসিয়ে রেখে চলে গেল। গদাই চলে যেতেই সম্বন্ধী বললেন. এবার বলো. তোমায় কত দিতে হবে?

—ছিঃ ছিঃ! বললেন শিবেনবাবু। বললেন. আমাকে কি ভাবেন আপনি? এ কী আমার পেশা?

—ইডিয়ট! বললেন, সম্বন্ধী। তারপর বললেন, সমস্ত পেশার উদ্দেশ্যই অর্থ উপার্জন। যদি তোমার আসল পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় হঠাৎ কিছু অর্থ

উপার্জিত হয় তাহলে কি সেটা তোমার পেশাজাত নয় বলে ফেলে দেবে? অর্থই মূল উদ্দেশ্য। ক্যাপিটালিস্ট সোসাইটিতে সমস্ত শক্তির উৎস। সেই উদ্দেশ্যের সিদ্ধিতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন পেশায় নামে। তুমি কি ইস্টদেবতাকে কথা দিয়েছো যে, তোমার মূল পেশা ব্যতিরেকে অন্য কোনো পেশায় অর্থাগম হলে তা তুমি ছোঁবে না?

শিবেনবাবু ভাবলেন, দাদা বাংলাটা অত্যন্ত ভালো বলেন। আকছার বক্তৃতা-টক্তিতা দেন তো। পণ্ডিতী আছে। রাজনীতি কি যার তার হয়? ভাল বাংলা বা ইংরিজী না জানলে কখনও দেশসেবক হওয়া যায় না!

দাদা বললেন, তবে হ্যাঁ। কাজ করে যাও, লোকের উপকার করে যাও, দেশের উপকার করো; টাকা আপনি তোমার পকেটে আসবে। যারা টাকা টাকা করে দৌড়য় তাদের টাকা হয় না কখনও। কোলকাতা শহরে টাকার কি দাম? দাম ক্ষমতার, প্রতিপত্তির, পলিটিক্যাল পাওয়ারের! তুমি কি জানো, আমার একটা টেলিফোনের দাম কত? একটা ফোন করে দেওয়ার চার্জ পাঁচ হাজার টাকা। তবে হ্যাঁ—ভারতের যেখানে বলবে, কয়েকটা স্টেট ছাড়া—আমি ডাইরেকট লাইনে বলে দেবো—কাজ হয়ে যাবে। এই ক্ষমতা একদিনে হয়নি হে। এর পেছনে অক্লান্ত সাধনা আছে, পরিশ্রম আছে।

তারপর একটু থেমে বললেন, পুরো পশ্চিম বঙ্গের স্টীয়ারিং এখন একদল ইয়ং এনার্জেটিক আর্যদের হাতে। জাত হিসেবে বাঙালী, রবিঠাকুর আর সুভাষ বোস ভাঙিয়ে ব্যাঙ্করাপট্ হয়ে গেলো।

তারপর একটা বুক-কাঁপানো নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বড় দুঃখ হয় হে, দেশের কথা ভাবলে দুঃখে বুক ভেঙে যায়। বাঙালী ছেলেগুলো বয়ে গেল—কিছুই করল না। আমার কাছে যারাই কাজ নিয়ে আসে তারাই রাঘব বোয়াল—কিন্তু কোলকাতায় বাঙালী বড়লোক কোথায়? আর নেই। সব শেষ।

তারপর একটু থেমে বললেন, তোমার এই নাটকের নেপথ্যে কে? বাঙালী?

শিবেনবাবু বললেন, না, পাঞ্জাবী।

—তবে? বলেছিলুম না? সম্বন্ধী বললেন।

তারপর বললেন, ইলেকশানে কি হবে বুঝছ? আমার পুরো পোলিটিক্যাল কেরিয়ার নির্ভর করছে এই ইলেকশানের উপর।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, ভেতরে যাও।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে আর কি হবে? বৌদি তো প্রায় পাঁচবছর হলো স্ট্রোকে শুয়ে রয়েছেন। বড় ছেলের উত্তর প্রদেশে বিরাট ব্যবসা। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে সেখানেই থাকে। ছোট ছেলেটি দার্জিলিং-এ পড়ে। মেয়ে বিয়ের পরই আত্মহত্যা করে মারা যায়।

শিবেনবাবু গিয়ে একটু বসলেন বৌদির কাছে। গোঁ গোঁ করে আওয়াজ করলেন বৌদি—চোখ দিয়ে জল গড়াল। কাছে কাউকে দেখলেন না শিবেনবাবু—একজন ঝি পর্যন্ত না। রান্না করছিল যে অল্পবয়সী সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি, সে-ই এসে একটু হরলিকস খাইয়ে গেল।

মেয়েটিকে ভালো করে দেখলেন শিবেনবাবু। মাধবীর কাছে এর কথা আভাসে শুনেছিলেন। মাধবীর দাদার রুচি ভালো।

বৌদির কাছ থেকে ফিরে গিয়ে দাদার কাছে এলেন।

দাদা বললেন, জ্যামাইকান্ রাম আছে, খাবে নাকি একটু? বাইরে বসে তো

ওসব চলে না। একটা ইমেজ-এর ব্যাপার আছে তো! ফিল্ম আর্টিস্টদের; আমাদের। তাই কাজ শেষ হলে, শোওয়ার ঘরে দুয়ার এ'টে খাই। রাম খেও মাঝে মাঝে, শরীরে ঘোড়ার মতো বল পাবে। বুয়েচো।

শিবেনবাবু বললেন, আজ্ঞে। কিন্তু আজ আর খাবো না। গদাই ফিরলেই বাড়ি যাবো। এরপর সেই-ই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

দাদা বললেন, তুমি আশা করো আর নাই-ই করো, আমার তো একটা কর্তব্য আছে। তুমি আমার ছোট ভগ্নীপতি। তোমাকে কিছু দেবো আমার থেকে। বুয়েচো! কাজটা হয়ে যাক। এসে নিয়ে যেও।

গদাই এসে পড়ল। কুসিকে সঙ্গে নিয়ে।

দাদা কুসিকে দেখে বললেন, এ কে?

গদাই বলল, এ আমাদের সঙ্গে আছে। আমাদেরই একজন। স্যার, অ্যামাউন্টটা একটু কনসিডার করলে হতো না?

দাদা এবার কুসির দিকে চাইলেন। কুসি পুষির মতো হাসছিল, আর বাঁ হাতে গলার মালাটা নাড়ছিল।

সম্বন্ধী কুসির দিকে চোখ স্থির রেখে বললেন, ঠিক আছে। দুই কম দিও। বলেই কুসিকে বললেন, মা, তোমার ঠিকানাটা আমায় দিয়ে যেও, ফোন আছে?

কুসি মাথা নেড়ে হ্যান্ড ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করল।

সম্বন্ধী গদাইকে বললেন, এ-ব্যাপারে যা খবরাখবর নেওয়া-দেওয়া তা একেই করতে বলো, কেমন? প্রেটী লেডী! কেউ সন্দেহ করবে না।

তারপরই বললেন, যান, এবার ঘুমোন গিয়ে। উ্য অল আর ইন সেফ হ্যান্ডস্। বলেই, কুসির দিকে সেফ্‌টি-ভাল্‌ভ্ চোখে চাইলেন।

কুসি ছেনালী-হাসি হাসল।

শিবেনবাবু বাড়ির দিকে চললেন। কুসি ও গদাই অন্যত্র। হয়তো লেপার্ড-এর কাছে—হোটেলে। রিপোর্ট করতে।

গাড়িটা ট্রাফিকের আলোয় দাঁড়িয়ে ছিল। লাল আলোটা শিবেনবাবুর সমস্ত মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছড়িয়ে গিয়ে নিষেধাজ্ঞার লাল আবিরে ভরে দিলো।

কারা যেন বলল, শিবেন না। নাঃ শিবেন। এই নোংরা দালালীর টাকা নিও না। ছোট করো না নিজেকে। যে-টাকা পরিশ্রম করে রোজগার না করা হয় সে টাকার ভাত কখনও মিষ্টি হয় না। না শিবেন। তুমি নিজে যা, যেমন, যতটুকু; তোমার সামর্থ্যকে বিষাক্ত কোরো না। সুখী হবেঃ শান্তি পাবে। ভুল কোরো না শিবেন।

কে যেন বলে উঠল, 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

শিবেনবাবু চমকে উঠলেন। নগেনদা। ইডিয়ট্।

লাল আলোটা সবুজ হলো, হলুদের পরে। কুসির শাড়িটাও হলুদ ছিল। হলুদ পরলে ওকে ভালো দেখায়। সবুজ আর চাপ-চাপ সবুজ—নরম সতেজ, প্রাণবন্তঘাস—আশ্বাস, ভয়হীনতা।

শিবেনবাবু একটা জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। মনে মনে বললেন, ডোন্ট বী আ সিলী সেন্টিমেন্টাল বেঙ্গলী ফুল। মানি ইজ এভরিথিং ইন লাইফ। মানি বিগেটস্ মানি। এত হাজার টাকা! পড়ে পাওয়া। তুমি নিজের হাত নোংরা করোনি। জাস্ট তোমার কন্‌টাক্‌টাকে এক্সপ্লয়েট করেছো। একজনদের বিপদ

উদ্ধার করেছো। মালহোত্রা জেল-এ গেলে ওর কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যেতো—কতগুলো লোক বেকার হয়ে যেত। গদাই-এর মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যেত—স্ত্রী না খেয়ে মরত—এগুলো কি যথেষ্ট কারণ নয়?

আর বব নন্দী? সে যে মরে গেল? ইয়াং এ্যামবিশাস্ একটি ছেলে। কুসিকে একটুও আপ্‌সেট দেখাল না তো। স্ট্রেঞ্জ ওয়ার্লড! ইজ ইট আণ্ডারওয়ার্লড?

শিবেনবাবু কি না জেনে আণ্ডার ওয়ার্লড-এর পার্ট হয়ে যাচ্ছেন? ওঃ বুলশীট্। বী রীজন-এবল্। বুধমলের ভাষায়। টাকা। অনেক টাকা। মিনুর বিয়ে দেবেন ভালো করে। জমি, জি-ব্লক। নিউ আলিপুর। মৃত্যুর সময় মাকে হাত ধরে কথা দিয়েছিলেন শিবেনবাবু।

মায়ের কথা মনে পড়ল শিবেনবাবুর। ছোটবেলায় মা বলতেন, শিবু সবচেয়ে আগে চরিত্র, তারপর পড়াশুনা, গুণাবলীঃ তারপর খেলাধুলো।

চরিত্রর ব্যাখ্যা কি? সেই যুগে চরিত্র বলতে যা বোঝাত এই যুগে তা বোঝায় না। চাঁদে মানুষ চলে গেছে আর চরিত্র কি এক জায়গায় বসে আছে? মাই ফুট!

না, না, শিবেন।

শিবেনবাবু নিজেকে বললেন, ডোন্ট বী আন-রীজনএবল্।

সকালে বাইরে যাবার কাজ ছিলো না। অফিসে বসে এ্যাপীলের ব্রিফ দেখছিলেন শিবেনবাবু। এমন সময় বুধমল এসে হাজির। দরজা ঠেলে ঢুকেই বলল, "সকল পদারথ্ হ্যায় জগ্মাহী, কর্মহীন নর্ পাওয়াত নাহী।"

—মানে? বলে শিবেনবাবু ভুরু তুলে চাইলেন।

বুধমল বলল, তুলসীদাস। পোয়েট তুলসীদাস ঈ বোলিয়ে ছিলেন।

—কি বলিয়াছিলেন? হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত শিবেনবাবু শুধোলেন বিরক্ত গলায়।

বুধমল আবার বলল, দুনিয়ামে হর চীজ হ্যায় মগর যো নর কর্মহীন সে কুছুভি পায় না। উপায় একঠো হয়েছে। হাকিমের উইকনেস্ একঠো বাহির করিয়েছি।

—কী উইকনেস্? বলে অবাক হয়ে শিবেনবাবু বুধমলের দিকে তাকালেন।

বুধমল হাসতে হাসতে বললো, গোলাপ ফুল। রোজেজ।

বলেই, অনেকগুলো গোলাপের বই ফেলে দিলো শিবেনবাবুর টেবলে।

বলল, শিবেনদাদা, আপনি হামার কাগোজপোত্তর একটু দেখিয়ে লেন—হিয়ারীং-এর সোমোয় আপনার সঙ্গে হামভি থাকবো। আপনি এ্যাপীল আগুমেন্ট করবেন আর হামি গোলাপ ফুল লিয়ে সাহেবের সঙ্গে কোথাবার্তা চালিয়ে লিবো।

—তুমি কি গোলাপের ভক্ত নাকি খুব? গোলাপ বাগান করো বুঝি?

—হামার গ্রাণ্ডফাদারভি কোখ্খোনো করলো না। গোলাপ-ফোলাপ ত আপনাদের বেপার। রইসীর বেপার। হামরা বেওসাদার আদমী—যোতোক্ষণ উ সব ফালতু ধান্দা করবেন আপনারা, হামরা তোতোক্ষণ কুছু কামিয়ে লিবো।

—তবে? শিবেনবাবু অবাক হয়ে আবারও শুধোলেন।

—তবে কি? কাম নিকালনা ত হোগা। কাল ঔর পড়শু দু-দিন দু-রাত খালি গোলাপহি ফুল লিয়ে পোড়াশুনা কোরলাম। গোলাপী জুতো মেরে আপীল কি করে জিতে লিব আপনি শুধু দেখে লিবেন।

তারপরই বলল, আপনার সোমোয় আছে?

—কেন? শিবেনবাবু শুধোলেন।

—এই বইগুলো আপনি রাখুন, হামি গোলাপ সোম্বোন্ধে আপনাকে একটি লেকচার দিবো। হামার কোনো ভুল হলে আপনি শুধরে দিবেন।

তারপরই বলল, ও হ্যাঁ। বাবা আপনার জন্য ঈ-দোশো রুপিয়া ভেজিয়েছেন। অ্যাপীল ঠিকসে হোয়ে গেলে উরভি তিনশো ভেজিয়ে দিবেন। এখোন পরীক্ষাটা লিয়ে লিন।

বলেই, বুধমল শিবেনবাবুর অপেক্ষা না করে গড়গড় করে বলতে শুরু করল।

দেখেন, গোলাপ ফুল বহুত কিসিমের আছে। যেমোন ধরুন লাল গোলাপ। গোলাপের মধ্যে লাল যে কেতোরকম হোয়, সে কী বোলবো। ক্রিমসন, স্কারলেট ফ্লেম, ভেনিসিয়ান, স্মোকি-ভিনিসিয়ান। ছোটা ছোটা গোলাপ ভি আছে—এক কিসিমের আছে তার নাম বেবী-ডার্লিং মিনিয়েচার। নামী গোলাপের মধ্যে

লিভিং ফায়ার—ফ্লেম কালারের। বার্মা স্টার—লাল ঔর ইয়ালোর মিক্সচার। প্রাইমা ব্যালেরিনা—একটু বাইগন রঙের আছে। মাই চয়েস্—এই কিসিমের খুশবু বেহেতরীণ। মিস্টিক ভী আছে—পিংক কলারের বিলাইতী নামী গোলাপ ফুলের ফার্ম স্যাম্ ম্যাগগ্রেভী কা ফ্লেমিং সান্‌সেট ভি বহুত নামী গোলাপ আছে। ফ্রান্সকা মশহুর ফ্যাশোন ডিজাইনার ক্রীশ্চিয়ান ডায়র-এর কুছু গোলাপ আছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস্।

শিবেনবাবু তাজ্জব বনে গেলেন। আলুর কোল্ড স্টোরেজের ব্যবসাদারের গোলাপের জ্ঞান দেখে। বললেন, অন্য রঙের গোলাপ কি হয় না?

—আলবৎ হোয়। বলল বুধমল। আপীল জিততে হলে, যে-রঙ চাইবেন. সে-রঙের হোবে।

তারপর বলল, যেমোন ধরেন কিংস র‍্যানসম্, ওল্ড গোল্ড; ইয়ালো রঙের। আইসবার্গ—সফেদ রঙা। খুসবয়—নীলা রঙ কি। গোলাপের কিস্‌সা শুনলে আপনি অবাক বনে যাবেন শিবেনবাবু।

শিবেনবাবু অবাক বনেই বললেন. পরীক্ষা তো পাশ করবে মনে হচ্ছে—কিন্তু সাহেব যদি তোমার গোলাপ বাগান দেখতে চান?

—সে ভি ইন্তেজাম করিয়ে রেখেছি। হামার সাড়ুভাই-এর সোলিসিটার টিবড়েওয়াল সাহাবের মধুপুরে বাগানবাড়ি, ওর গোলাপবাগান ভি আছে। সেখানে গোলাপের বাডিং হয়। বহুত বড়ো ফার্ম আছে। সাহাবকে সেকেন্ড সেটারডে ওর সান্‌ডের ছুট্টিতে সেখানে ভি লিয়ে যাবো। রাবড়ি-উবড়ি খিলাবো ঔর গোলাপ দেখিয়ে দিল্ খুস করিয়ে দিবো। কাটিং-উটিং ভি ভেজিয়ে দিবো সঙ্গে। ঔর কোনো চিন্তা নাই।

—অ। শিবেনবাবু বললেন। তাঁর বাক্‌রোধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

বুধমল বলল, আপনি দাদা মীথলজিকাল্ গ্রীক ফাইটার একীলিসে্র নাম কোখখ্‌নো শুনেছেন?

—একীলিস্? না তো? শিবেনবাবু অজ্ঞতা জানালেন।

বললেন. আমি বাবা আইন-কানুন একটু জানি—অন্য কিছুই জানি না।

বুধমল একটা সিগারেট ধরালো। বলল, একীলিস্ বহুত বড়া ফাইটার ছিল। তাকে কেউ কোথ্‌খনো হারাতে পারত না। মগর তার ভি একটো উইক স্পট ছিল বদনে—তাঁর গোড়ালী—হিল। তার গোড়ালীতে কোথ্‌খনো তীর লাগলে তার বাঁচবার কোঈভি চান্স ছিলো না। মগর স্রিফ্ ই গোড়ালীতে। সারা বদনমে ঔর কোঈ ভী জাগেমে কুছভি হোতো না। উসী লিয়ে সাহাবলোক অংরেজীমে বোলে—একীলিসেস্ হিল্।

তারপর একটু দম নিয়ে বুধমল বলল, ব্যানার্জী সাহাব—একীলিসের ভি উইক পয়েন্ট থা। হামারা অ্যাপেলেট আসিস্টান্ট কমিশনারকা উইক পয়েন্ট ভি হামে বের করিয়েছি। এখোন হামার আপীল নিয়ে আর কোঈ চিন্তা নেহি। হাপনি শুধু আইনকি মোতাবেক যো ভি কহনা আপ্‌কা—ওহি আর্গু কর দিজিয়েগা—ঔর হামারা উপর ছোড় দিজিয়ে। রিলিফ উনকো বাপ্‌নে দেগা।

শিবেনবাবু চুপ করে বসেছিলেন।

বুধমল বলল, কলেজ ছেড়ে আসবার পোরে এতো পড়ালিখা বহুত রোজ করলাম না দাদা—লাস্ট দু রাত দু দিনে গোলাপ লিয়ে যা করলাম।

তারপর বলল, হামি ডেট লিয়ে এসেছি। হামার ফোরেনে যাবার আগে আগে

ঈ-ঝামেলা চুকা দিজিয়ে। পিলিজ্।

শিবেনবাবু বললেন, ডিপোজিশানের কপি এনেছো?

—অ্যাপ্লাই করে দিয়েছি, কাল পরশু লিয়ে আসবো। আপ্ বে-ফিক্কর রহিয়ে।

—তবে কাগজপত্র দিয়ে যাও। শিবেনবাবু বললেন, দেখে রাখবো অবসর সময়ে।

—সোব লিয়ে এসেছি। দেখে রাখবেন পিলিজ্। হামাকে একদফে টিংকল দেনেসে হামি তুড়ন্ত্ চলে আসবো।

—ঠিক আছে। বলে কাগজপত্র নিয়ে টেবলের পাশে রাখলেন শিবেনবাবু।

বুধমল চলে গেলে, একটা ট্রাইব্যুনালের ব্রিফ দিয়ে রঘুকে পাঠালেন বার লাইব্রেরীতে নগেনদার কাছে। বলে দিলেন, লাইব্রেরীতে না থাকলে যেন বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসে। রঘু এক সময় নগেনদার বেয়ারা ছিল। শিবেনবাবু যখন নগেনবাবুর অফিস ভেঙে ওঁর অনেক মক্কেল নিয়ে চলে আসেন তখন রঘুকেও সঙ্গে এনেছিলেন। নগেনবাবুর বর্তমান অবস্থা দেখে ও শুনে শিবেনবাবুর মতো রঘুও অত্যন্ত ব্যথিত। বোঝে সব; মুখে কিছু বলে না। এই মামলায় প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা মত ইনভলভ্ড। খুব বড় মক্কেল। মক্কেল বলেছেন, জিততে পারলে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। হারলে কটা কিল দেবেন তা বলেননি। তাই শিবেনবাবু এই কেসের দায়িত্ব নিজে নিতে চাননি।

তাছাড়া, সেদিন নগেনদার বাড়ি যাওয়ার পর থেকেই মনে মনে ঠিক করেছিলেন যে, কমপ্লিকেটেড ম্যাটার ও সিনিয়রের ব্রিফ সব নগেনদাকেই দেবেন এবার থেকে।

কাগজপত্র দেখতে দেখতে অনেক বেলা হলো। চা-তেষ্টা পাওয়াতে অভ্যাস-বশত শিবেনবাবু ঘন্টা বাজালেন। ঘন্টা বাজিয়েই খেয়াল হলো তিনিই রঘুকে নগেনদার বাড়ি পাঠিয়েছেন।

একটু পর রঘু ফিরল। হাতে ব্রিফ নিয়ে, সঙ্গে নগেনদার সংক্ষিপ্ত চিঠি। শিবু, মাই সিনসীয়র থ্যাংকস্। বাট আই অ্যাম আনেবল টু এ্যাকসেপ্ট ইওর টোকন অফ চ্যারিটি।

শিবেনবাবু গতকালই লেপার্ড কাউর ও শালাবাবুর কাছ থেকে টাকাটা কালেক্ট করেছিলেন। লেপার্ড-এর কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে। শিবেনবাবু জানেন যে, যদি ইলেকশানে বড় রকমের একটা ওলোট পালোট কিছু না হয়, তাহলে কোলকাতার হাই-সোসাইটিতে তাঁর রেপুটেশান ছড়িয়ে যাবে। এও একরকমের দালালী। আগেকার দিনে রাজা মহারাজাদের মোসাহেব ও দালাল থাকত। সে-রকম একাধিক দালালকে তিনি দেখেছেন, ঘনিষ্ঠভাবে জানার সুযোগও এসেছিল তাঁর প্রফেশানের মাধ্যমে। দালালী কথাটা বড় খারাপ শোনায়। কিন্তু এই দু' নম্বর পৃথিবীতে কন্-ম্যানেরাই মোস্ট-পাওয়ারফুল। দালালদের আজকাল আর কেউ দালাল বলে না, বলে আ পার্সন উইথ হাই কন্টাক্টস্। টার্মটা অনেক রেস্-পেক্টেবল।

ফোকটের টাকাটা গতকাল পাওয়াতে তাঁর মেজাজ বেশ নরম ছিল। নগেনদার এই ঔদ্ধত্যে তাঁর খুব রাগ হলো। মনে মনে বললেন, ইডিয়ট্। হি রিয়্যালি ইজ ওয়ান অফ দ্যা লাস্ট মোহিকানস্। আন্-রীজনএবল।

কার কাছে যেন শুনেছিলেন যে, কেপেবল্ লোক মাত্রই গর্বিত লোক হন। কিন্তু কথাটার আজকের দিনে কোনো দাম নেই। গর্ব নিয়ে, মাথা উঁচু করে আজকের দিনে মূর্খরাই উপোস করে মরে। গর্বের দাম কেউই দেয় না

আজকে। একটা মহীরুহ থাকলে তার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিছুটি ও ঝোপঝাড়ের দল মহীরুহকে কি করে ধরাশায়ী করা যায় সে বিষয়ে ষড়যন্ত্র করে। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই গর্বিত মহীরুহের দিন চলে গেছে। অসাধারণের জন্যে সাধারণরা পথ ছাড়তে রাজী নয় আর, কারণ অসাধারণের অস্তিত্বে সাধারণদের সাধারণত্বর দৈন্য বড় নগ্নভাবে প্রকট হয়ে পড়ে।

তবু, শিবেনবাবু উঠলেন। গাড়ি নিয়ে নগেনবাবুর বাড়ি গেলেন সোজা। নগেনদা একা লাইব্রেরীতে বসে লিগ্যাল ডিকশ্যানারীর পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

শিবেনবাবু ঢুকেই বললেন, নগেনদা! আমার নিজেকেই আসতে হলো

—কেন? বলে নগেনবাবু মাথা তুললেন।

—আপনি আমার ব্রিফ ফিরিয়ে দিলেন?

—দিলাম।

—কেন?

—কারণ তুমি আমাকে দয়া করে রোজগারের পথ করে দিতে চাইছ।

—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন? এই মক্কেল আমার খুব বড় মক্কেল—হেড অফিস বিলেতে—"বিজনেস কানেকশান্সের" উপর খুব কমপ্লিকেটেড ম্যাটার ইনভল্‌ভড আপনি ছাড়া এ কেস আর কেউ আর্গু করতে পারবে না এফেক্টিভলি। ফীস্‌ও দেবে কোলকাতার সিনিয়রমোস্ট কাউনসেলের সমান।

নগেনদা হাসলেন। বললেন ফীস্‌ দেখে কি তোমরা আজকাল কাউনসেলের গুণাগুণ বিচার করছো নাকি?

—না, তা নয়, তবে ফীসটা তো একটা পয়েন্টার।

—পয়েন্টার টু হোয়াট?

—পয়েন্টার টু সাক্‌সেস্‌।

নগেনদা হেসে ফেললেন। ভারী সুন্দর দেখালো হাসিটা। বললেন, তাই-ই বলো, আজকের এই রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড্‌ 'প্রাগ্‌ম্যাটিক' পৃথিবীতে সাক্‌সেস ইজ দ্যা মেজার অফ এভরিথিং। এণ্ড নাথিং সাকসীডস্‌ লাইক সাকসেস্‌।

শিবেনবাবু বললেন, সে যাই হোক, আমি ফাইল রেখে গেলাম। আগামী সোমবার ম্যাটারটা ফিক্‌সড আছে। কনফারেন্সের দরকার হলে আমাকে জানাবেন আমি কোম্পানীর ট্যাকস এ্যাকাউন্ট্যান্টকে সঙ্গে করে আসব। তবে পেপারবুক আমি বানিয়ে রেখেছি—কোনো মডিফিকেশান থাকলে জানাবেন।

নগেনদা একদৃষ্টে শিবেনবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর বললেন, শিবু, আমি ছিট-কাপড়ের দোকান দিলে তোমাদের বিব্রত বোধ করার কারণ কি? গোপেন, খেলু, কেষ্ট সকলেই দেখি এ-সপ্তাহে আমাকে সিনিয়র ব্রিফ পাঠিয়েছে। হঠাৎ। তুমি বুঝি আমার এই ডিসিশানের কথা সকলকে বলেছ?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, আমি প্রফেশান ছেড়ে দিলে তোমাদের লজ্জিত হবার কী কারণ তা তো আমি বুঝছি না।

শিবেনবাবু বললেন, আপনি আমাকে মারুন, বকুন, ব্রিফ আপনাকে নিতেই হবে। অন্যরা কি করছে তা আমি জানি না। আমি আপনার জুনিয়র ছিলাম আপনি হাতে করে আমাকে তৈরী করেছেন।

নগেনবাবু খোলা জানালা দিয়ে বাইরে চেয়েছিলেন। বললেন, আমি তৈরি করিনি। আমার শিক্ষা নিলে তুমি আজকে এতখানি কম্প্রোমাইজিং হতে না

যাক্, যা করেছে তাতে তোমার ভালই হয়েছে। কিন্তু তোমার ভালো এবং আমার ভালো এক নয়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে নগেনবাবু বললেন, জানো শিবু, একটা কথা আজকাল আমার প্রায়ই মনে হয়।

—কি কথা? শিবেনবাবু বললেন।

—মনে হয় পারফেক্শানিস্ট হওয়ার মতো ইডিয়সী আর দুটি নেই। পারফেক্শানিস্ট মাত্রই নন্-কনফরমিস্ট। তাদের মধ্যে একটা আনকম্প্রোমাইজিং এ্যারোগান্ট মানুষ বাস করতে আরম্ভ করে। আমার মনে হয়, তুমি যদি আমার কথা শুনতেও তাহলেও তোমাকে আমার মনোমত করে কখনও গড়ে তুলতে পারতাম না। একজন পারফেক্শানিস্ট লোক কখনও সেকেণ্ড ইন লাইন তৈরি করতে পারে না। তাছাড়া যে পারফেক্শানিস্ট সে বোধহয় অন্যের মধ্যে পারফেক্শান দেখলে আঁতকে ওঠে—ভয় পায়। জানি না। হাওয়েভার, ইটস টু লেট ফর মি। ইটস টু লেট টু মেণ্ড মাইসেল্ফ। আই এ্যাম ডেস্টিনড্ টু বী ডেস্ট্রাক্টেড। বাট আই এ্যাম নেভার ডেস্টিনেড টু বী ডিফিটেড। হারা কাকে বলে আমি জানি না শিবেন। যতদিন বাঁচি, জানতে চাই না; জানবো না। আমিই ঠিক, কী তোমরাই ঠিক তা পসটারিটি বিচার করবে।

'পসটারিটি'র কথায় শিবেনবাবুর বিজিতেনদার কথা মনে পড়ে গেল হঠাৎ!

শিবেনবাবু বললেন, আমি চললুম। চেম্বারে যাবো।

নগেনবাবু বললেন, এই অ্যাপীল আমার করতেই হবে?

—হ্যাঁ। আবদারের গলায় শিবেনবাবু বললেন।

—তাহলে সোমবার নয়—একটা শর্ট এ্যাডজোর্নমেন্ট নাও। সোমবার আমার মায়ের বাৎসরিক কাজ।

শিবেনবাবু বললেন, আচ্ছা।

সোমবার দিন পেছিয়ে বুধবার দিন করা হলো। নগেনবাবুকে সিনিয়র কাউনসেল এ্যাপয়েন্টমেন্ট করছেন এই মর্মেই পিটিশন দিয়েছিলেন শিবেনবাবু।

বুধবার ট্রাইব্যুনালে গিয়ে শোনেন যে কজ্ লিস্টের মাঝামাঝি আছে ওঁর ম্যাটার। শিবেনবাবু লজ্জিত হলেন দেখে যে, তাঁর সিনিয়র নগেনবাবু তাঁর আগেই এসে বসে আছেন।

তাঁকে দেখে নগেনদা বললেন, শিবেন, এ-এ-সি-র অর্ডারের এগেইনস্টে রেকটিফিকেশান পিটিশান করেছিলে?

—না তো! শিবেনবাবু বললেন।

নগেনবাবু এ-এ-সির অর্ডারের তেরো নম্বর পাতার কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফে আন্ডারলাইন করা চারটি লাইন দেখালেন, তারপর এ্যাসেস্মেন্ট অর্ডার ঃ গ্রাউন্ডস অফ অ্যাপীলও দেখালেন।

লজ্জায় শিবেনবাবুর কান লাল হয়ে গেল। মাথা নীচু করলেন, মুখে কিছু বললেন না।

নগেনবাবু বললেন, দিস উইল বী আ স্টামব্লিং ব্লক। এতদিনেও কাজ শিখলে না শিবু!

এমন সময় একজন মেম্বারের বেয়ারা এসে শিবেনবাবুকে ডাকলেন।

শিবেনবাবু দোতলায় গিয়ে মেম্বারের ঘরে ঢুকতেই মেম্বার খাতির করে বসতে বললেন।

তারপর বললেন, মিস্টার ব্যানার্জী, হোয়াই ডু উ্য রিকুয়ার আ সিনিয়র কাউনসেল ফর? আর নট্ উ্য সাফিসিয়েন্টলি সিনিয়র?

শিবেনবাবু প্রথমত কথাটা বুঝতে পারেননি। যখন বুঝলেন, তখন দেরী হয়ে গেছে অনেক। নগেনদার কারণেই হয়ত আজ কেসটা হারবেন তিনি। মক্কেল রেজাল্ট দেখবে, আর কিছুই নয়।

মেম্বার তারপর বললেন, থ্যাংক উ্য ফর কামিং। দ্যাটস্ অল।

শিবেনবাবু করিডর দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে ভাবতে লাগলেন যে, নগেনদাকে মেম্বারেরা যে এতখানি অপছন্দ করেন তা তাঁর জানা ছিলো না। শিবেনবাবু বেশ নার্ভাস ফীল করতে লাগলেন। মক্কেল পাল্কিওয়ালা অথবা অশোক সেনের কথা সাজেস্ট করেছিলেন সিনিয়র কাউনসেল হিসেবে। শিবেনবাবু নিজের দায়িত্বেই বলতে গেলে ওঁদের তুলনায় স্বল্পখ্যাত নগেনদাকে ব্রিফ দিয়েছেন।

তাড়াতাড়িই ডাক পড়ল। আগের অনেকগুলো ম্যাটার এ্যাডজোর্নড্ হয়ে গেছিল।

নগেনদা আর্গুমেন্ট শুরু করলেন। নগেনদার পাশে বসে আর্গুমেন্ট শুনতে শুনতে কিন্তু মনে হয় শব্দতরঙ্গে কোন এক স্বপ্নলোকের দিকে ভেসে চলেছেন যেন। মনে হয় না আইনের কচকচি শুনছেন। যেমন ভোক্যাবুলারী, তেমন শুদ্ধ সুন্দর উচ্চারণ। বড় বড় জেনারেলরা যেমন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন, নগেনদাও তেমনি করে একক জেনারেল ও একক সৈন্য হয়ে দু পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে তীব্র

তীক্ষ্ণ ও সুচিন্তিত পথে সওয়ালকে কুচকাওয়াজ করিয়ে নিয়ে যান। ব্রিলিয়ান্ট্!

সওয়াল শুরু হওয়ার মিনিট দশেক বাদেই, হঠাৎ জুডিসিয়াল মেম্বার ভুরু কুঁচকে বললেন, মিস্টার মুখার্জী, আই থিংক দেয়ারস সামথিং রং উইথ দ্যা সেন্টেন্স।

নগেনদা যে সেন্টেন্সটি পড়ছিলেন, নেগেটিভ দিয়ে তার আরম্ভ।

শিবেনবাবুর মক্কেলের সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ইনভলভড এই মামলায়। তিনি নিজে হলে, ইংরেজী ভাষার মৃতদেহের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়েও রিলিফ পেতে চাইতেন, কিন্তু সওয়াল করছেন নগেন মুখার্জী, শিবেন ব্যানার্জী নন।

নগেনদা বেশ অনেকক্ষণ নিরুত্তরে জানালা দিয়ে দূরের মালটিস্টোরিড বাড়ির দিকে চেয়ে রইলেন।

কোর্টরুমে ছুঁচ পড়লেও তখন বোমা পড়ার আওয়াজ হতো।

হঠাৎ নৈঃশব্দ ভেঙে নগেনদা বললেন, ওয়েল, সো ফার মাই নলেজ অফ ইংলিস গোজ, দেয়ারস নাথিং রং উইথ দ্যা সেন্টেন্স।

অনারেবল মেম্বারের মুখ প্রথমে বেগুনে তারপর লাল হয়ে গেল।

মেম্বার বললেন, আপনি কি বলতে চাইছেন যে আমি ইংলিশ গ্রামার জানি না?

নগেনদা বললেন, দ্যাট গ্লেয়ারিং ফ্যাক্ট ডাজন্'ট রিকুয়ার এনিবডিজ সেয়িং!

অনারেবল মেম্বার ঠ্যাঁটা লোকের সঙ্গে তর্ক করবেন না মনস্থ করে দু হাত নেড়ে বললেন, ওয়েল, মিঃ মুখার্জী আই এ্যাম আ ফুল সিটিং হিয়ার। আই ডু নট নো এনিথিং এ্যাবাউট এনিথিং।

শিবেনবাবু মেম্বারের মুখের দিকে কাঁদো-কাঁদো মুখে তাকালেন, ভাবটা, দয়া করে দুর্বিনীত নগেন মুখার্জীকে ক্ষমা-ঘেন্না করে দিন হুজুর। হুজুর মা-বাপ।

কিন্তু সমস্ত কোর্টরুমকে, ডিপার্টমেন্টাল রিপ্রেজেনটেটিভদের, শিবেনবাবু ও মক্কেলের লোকেদের স্তম্ভিত করে, নগেনদা মেম্বারকে বাও করলেন একেবারে মাথা নুইয়ে– তারপর দুহাত ব্যালেরিনার মতো দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে জুডিসিয়াল মেম্বারের মন্তব্যের উত্তরে বললেন, 'ইয়োর অনার। উই আর ভেরী পেইনফুলি এ্যাওয়ার অফ দ্য ফ্যাক্ট!'

কোর্টরুমে প্রায় দীর্ঘ পাঁচ মিনিট আর কোনো কথা শোনা গেলো না। শিবেনবাবু নগেনবাবুর কনুই ধরে টানাটানি করলেন। তাতেও ফল না হওয়ায় হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পর অনারেবল এ্যাকাউন্ট্যান্ট মেম্বার বললেন, মিঃ মুখার্জী, উ্যু মে রিজিউম ইয়োর আর্গুমেন্ট।

শিবেনবাবু মেম্বারদের প্রতি বড় কৃতজ্ঞ হলেন। ওঁরা যে নগেনবাবুকে কনটেমপট্ অফ কোর্টের দায়ে ফেলেননি এ নগেনবাবুর পিতৃপুরুষের সৌভাগ্য!

এ্যাপীল সম্বন্ধে শিবেনবাবুর আর কিছু আশা করার ছিলো না। তিনি মাথা নীচু করে বসেছিলেন। মেম্বারদের মুখের দিকে একবার তাকান এমন মানসিক অবস্থাও তাঁর ছিল না। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো। এমন ব্যবহারও কেউ করে—এই কি উকিলের কাজ?

নগেনদার সওয়াল শেষ হলে, ডি-আর সওয়াল শুরু করলেন। অনারেবল মেম্বারেরা তার উপর ডি-আরকে লিডিং কোয়েশ্চেনস করে করে ডিপার্টমেন্টের

ফেভারে যা যা পয়েন্ট আছে সব ভালো করে নোট করলেন।

ডি-আর-এর সওয়াল শেষ হতেই নগেনদা ডি-আরকে তুড়ে গালাগালি করলেন। ব্যক্তিগত অপমানজনক কথাও বললেন, সে সব কথা বলার কোনো দরকার ছিলো না। লাভ ত ছিলোই না।

শিবেনবাবুর মনে পড়ল, একদিন—বহুদিন আগে নগেনদা তাঁকে বলেছিলেন, দ্যাখো শিবু, কিছুতেই কন্ট্রোল করতে পারলাম না। ব্রহ্মচর্য করেছি, প্রাণায়াম করেছি, লোভ জয় করেছি, কাম জয় করেছি; কিন্তু ক্রোধ জয় করতে পারিনি। আই হ্যাভ আ ভেরী বিটার টাং। হোয়েন ইট ইজ আন্‌লীশড্ ইট বিকামস আনকন্ট্রোলেবল।

তারপরই নগেনবাবু বলেছিলেন, রাগই হচ্ছে হীনতম দুর্বলতা। বুঝি, জানি, অথচ সব দেখেশুনে রাগ না-করেও পারি না। সত্যিকারের সবল এবং সাহসী লোকেরা কখনও রাগে না।

সওয়াল শেষ হতেই বরাবর যা করেন, অন্য কারো জন্যে অপেক্ষা না করেই বড় বড় পা ফেলে নগেনদা কোর্টরুম থেকে বেরিয়ে লিফট-এর দিকে চলে গেলেন।

মাথা নীচু করে পেপারবুক, কাগজপত্র সব গুছিয়ে শিবেনবাবু কোর্টরুম থেকে বেরুতে না বেরুতে লিফট-এর সামনে থেকে একটা হৈ হৈ আওয়াজ শুনলেন। বেরিয়ে এসে দেখেন নগেনদা মাটিতে পড়ে আছেন। বার লাইব্রেরী থেকে অনেকে দৌড়ে গেলেন ওদিকে। শিবেনবাবুও মক্কেলের লোকেদের হাতে কাগজপত্র দিয়ে দৌড়ে এলেন। নগেনদার জ্ঞান নেই কোনো। কেউ বললেন, সেরিব্রাল অ্যাটাক, কেউ বললেন করোনারী। ভীড়ের মধ্যে ডাক্তার কেউই ছিলো না।

তাড়াতাড়ি করে নগেনদাকে নামিয়ে নেওয়া হলো নীচে। রাখহরিবাবুর মক্কেলের মার্সিডিস্ গাড়ি ছিলো—সেই বড় গাড়িতে শুইয়ে নগেনদাকে সোজা পি-জি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। সংগে উকিলদের মধ্যে দু-একজন গেলেন পিছন পিছন গাড়ি নিয়ে।

এমার্জেন্সীতে এনে টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হলো নগেনদাকে। ডাক্তার এসে নাড়ি দেখলেন, মুখটা বিকৃত করলেন। বুকে স্টেথিসকোপ বসালেন, তারপর এমার্জেন্সী রুমের স্তব্ধ প্রতীক্ষামুখর নৈঃশব্দকে চমকে দিয়ে বললেন, স্যরি। হি ইজ ডেড।

গোপেনবাবু বললেন, এটলাস্ট, হি ইজ এ্যাট পীস্ উইথ হিমসেলফ্।

আর কেউই কিছু বললেন না।

কেওড়াতলায় খুব একটা ভীড় হয়নি। নগেনদার আত্মীয়স্বজন ক'জন। ভবানী-পুরের পাড়ার বেশ কয়েকজন ছেলে, সানুর রেস-খেলা, বাংলা-খাওয়া কিছু বন্ধু-বান্ধব, চার পাঁচজন উকিল, শিবেনবাবুকে নিয়ে।

নগেনদাকে নিয়ে ও'রা যখন ভবানীপুরের বাড়ি পৌঁছেছিলেন গাড়ি করে তখন সানুই দরজা খুলেছিল। খুলে, অবাক হয়ে বলেছিল, আই বাপ, বাপ আমার সত্যিই ফুটে গেলি!

বলেই, শিশুর মতো কান্নায় ভেঙে পড়েছিল নগেনদার বুকে। সেই সানু অন্য সানু। কত কথা বলছিল সে তার এ্যানিম্যাল বাপের সংগে। ওকে তখন দেখে শিবেনবাবুরও ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল।

বার লাইব্রেরী থেকে একটা বিরাট মালা পাঠিয়েছিলেন। এ্যাকাউন্ট্যান্ট লাইব্রেরী থেকেও। ইলেকট্রিক ফার্ণেস খারাপ ছিল সেদিন। কিন্তু জোর হাওয়া ছিলো। তাই দাউ দাউ করে চিতা জ্বলছিল।

বিজিতেনবাবু কোথা থেকে খবর পেয়ে, বোধহয় ডাকাবাবুর কাছ থেকেই, এসে পৌঁছেছিলেন শ্মশানে শব আসার আগেই। বুকের কাছটা ছেঁড়া হাওয়াইন সার্টটার—হাতে বিবর্ণ ছাতাটা—ইস্ত্রিবিহীন একটা ছাই-রঙা প্যান্ট।

শিবেনবাবুকে ফিসফিস করে বললেন, গেল গিয়া, এট্টা মনিষ্যির মতন মনিষ্যি আছিলো। এই মেকীর দুনিয়ায় বড় খাঁটি হে। বোঝলা শিবেন, এহনে এমন মনিষ্যি বড় এট্টা দেহি না।

বলেই, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ট্রাইব্যুনালের কয়েকজন মেম্বারও এসেছিলেন। যে-বেঞ্চে শিবেনবাবুর কেস ছিলো সেদিন সকালে, সে-বেঞ্চের মেম্বার দুজনও।

জুডিসিয়াল মেম্বার শিবেনবাবুকে ডেকে বললেন, মিঃ ব্যানার্জী। আমরা খুবই দুঃখিত। হি ডিডনট বিলঙ টু দ্যা রান অফ দ্যা মিলস্। হি ও'জ ভেরী ডিফারেন্ট। আ গ্রেট ইনডিভিজুয়াল। ইনভিড হি ও'জ। আমরা ও'কে খুব সম্মান করতাম। ও'র কম্পিটেন্স সম্বন্ধে আমরা সকলেই একমত। ইটস্ আ গ্রেট লস টু দ্যা বার।

শিবেনবাবুর চোখে জল এসে গেল। কোনোক্রমে চেপে, অর্ধদগ্ধ জ্বলন্ত শবের দিকে চেয়ে বললেন, নগেনদা শুনলেন, এ'রা কি বললেন? শুনলেন নগেনদা?

সব শেষ হতে হতে রাত দশটা। বিজিতেনদা মিনিট পনেরো আগে গেছেন। শিবেনবাবুই বলে বলে পাঠালেন। বললেন, আপনি এই কেওড়াতলা থেকে সেই নর্থে যাবেন, এগিয়ে যান। আর থেকে কি করবেন?

বিজিতেনদা বললেন, তুমিও তো যাব্দ।

—আ হাঃ আমার তো গাড়ি আছে। আপনি তো বাসে যাবেন—আর থেকে কি করবেন, এগিয়ে যান। আমার অনেক দেরী হবে।

—হঃ যাই। বলে, যেন নগেনদার ছাই ছেড়েও যেতে মন সরছে না এমনভাবে চলে গেলেন বিজিতেনদা।

চিতাশান্তি করে শিবেনবাবু যখন গাড়ি স্টার্ট করলেন, তখন সকালে কেসটা হেরে যাওয়ার দুঃখটা নগেনদার মৃত্যুর দুঃখের চেয়েও বেশী করে বাজল বুকে। পরক্ষণেই শিবেনবাবু একটু উৎসাহিত বোধ করলেন। অনারেবল মেম্বাররা নিজেরা যখন শ্মশানে এসেছিলেন তখন তাঁদের মনেও নিশ্চয়ই নগেনদার জন্যে একটু দুঃখ হয়ে থাকবে। নগেনদা তো আর ওঁদের কাছে কোনোদিনও অ্যাপীয়ার করবেন না। নগেনদার শেষ সওয়াল বলে ব্যাপার—যদি ওঁরা জিতিয়ে দেন! সওয়াল জবরদস্ত্ করেছিলেন নগেনদা, শুধু মেম্বারদের খামোখা অপমান করাতেই অ্যাপীলটা খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা।

রাসবিহারী এ্যাভিনুার মোড়ের দিকে যেতে যেতে শিবেনবাবুর মনটা ভাল লাগতে লাগল। খুশী খুশী লাগল একটু। নগেনদা আজ মারা না গেলে এই এ্যাপীলে জেতার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত ছিলো। নগেনদা মরে গিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে গেলেন। শিবেনবাবু বললেন, থ্যাঙ্ক উ্য নগেনদা!

রাসবিহারীর মোড়ের কাছাকাছি এসেছেন শিবেনবাবু, হঠাৎ বাঁদিকের ফুট-পাথ দিয়ে দেখেন, সামনে বিজিতেনদা চলেছেন। শিবেনবাবু গাড়ি থামিয়ে দিলেন। বিজিতেনদাকে দেখলেই সঙ্গে নিতে হবে। রিটায়ার্ড লোককে খাতির করার মতো বোকা শিবেনবাবু নন, অমন সময়ও তাঁর নেই। তাছাড়া লোকটা এমন এমন সব কথা বলেন যে, নিজের বুকের মধ্যেও কারা যেন সব কথা বলে ওঠে। অনেস্টি। পসটারিটি। এদিকে স্ত্রীর ইউট্রাসে ক্যানসার। এসব লোককে ভয় পান শিবেনবাবু বড়। কারণ শিবেনবাবুর বুকের মধ্যেও একজন বিজিতেন-বাবু যে বাস করেন! সেই বিজিতেনকে সবসময় টাকার আর সাক্সেসের সেডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন উনি। সেই বিজিতেনের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে, যায়ও। সেটা বড়ই ডিস্টার্বিং। এসব অনেস্টি, পসটারিটির কথা তাঁর সঙ্গে কেউ আলোচনা করুক এ শিবেনবাবু চান না। এই সব মহামূর্খরা তাঁর মনের অনেক কষ্টে লব্ধ শান্তিকে বিঘ্নিত করুন শিবেনবাবু তা একেবারেই পছন্দ করেন না।

বিজিতেনবাবুকে বাস ধরতে এগিয়ে যেতে সময় দিলেন শিবেনবাবু। সিগারেট ফুরিয়ে গেছিল। গাড়ি থেকে নেমে পানের দোকান থেকে সিগারেট কিনলেন এক প্যাকেট। মনে মনে হিসেব করলেন যে, বিজিতেনদার বাসে করে বাড়ি পৌঁছতে প্রায় এগারোটা হবে। হ'ল, হবে। উপায় কি?

গাড়িটা আবার স্টার্ট করতেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি নামল। রাসবিহারীর মোড়ে লাল ট্রাফিক আলোতে দাঁড়ালেন শিবেনবাবু।

ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরা শীর্ণ এক বুড়ি বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েছিল। পাশেই মোটা-সোটা ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক স্বচ্ছল ভদ্রলোক। তিনি পান দিয়েছিলেন সবে মুখে।

বুড়ি, ভদ্রলোককে তাড়াতাড়িতে বড় উত্তেজনার সঙ্গে শুধোলো, বাপ্, অ-বাপ্, ধর্মতলা যাবো, কত নম্বর বাসে চাপব বাপ?

ভদ্রলোক মুখে পান দিয়ে ভুরু তুলে বুড়ির দিকে তির্যক চোখে তাকালেন।

বুড়ি আবারও বলল, বাপ ধর্মতলা, কত নম্বরে চাপব বাপ?

ভদ্রলোক পানের পিক্টা গিললেন।

তারপর বললেন, দু নম্বর।